Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে ইসলামের দুশমনদের শেষ পরিণতি ও শিক্ষা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাইমা বিনতে সলীম

রোলঃ 215001071216

১৮ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে ইসলামের দুশমনদের শেষ পরিণতি ও শিক্ষা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাইমা বিনতে সলীম

রোলঃ 215001071216

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "যুগে যুগে ইসলামের দুশমনদের শেষ পরিণতি ও শিক্ষা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাইমা বিনতে সলীম, আইডিঃ 215001071216 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যুগে যুগে ইসলামের দুশমনদের শেষ পরিণতি ও শিক্ষা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

সাইমা বিনতে সলীম

আইডিঃ 215001071216

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

১৮ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা..7
অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা..9
নূহ আলাইহিস সালাম..11
নূহ আলাইহিস সালাম-এর পরিচয়..13
তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা..16
স্বীয় কওমের প্রতি নূহ আলাইহিস সালাম-এর দাওয়াত..18
নূহ আলাইহিস সালাম-এর বিরুদ্ধে পাঁচটি আপত্তি..19
আপত্তি সমূহের জবাব..20
নূহ আলাইহিস সালাম-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি..24
নূহ আলাইহিস সালাম-এর প্লাবন ও গযবের কুরআনী বিবরণ..28
অন্যান্য বিবরণ..30
আদ জাতি..34
আদ জাতির প্রতি আল্লাহর নির্দেশ..35
আদ জাতির ধ্বংসের কারণ..36
আদ জাতির প্রতি আল্লাহ আযাব প্রেরণ..39
সামুদ জাতি..41
নমরুদ..47
কওমে লূত..51
লূত আলাইহিস সালাম এবং তার জাতির বিবরণ..52
সমকামিতায় আসক্ত লূত আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়..53
সমকামিতা ব্যভিচার থেকেও জঘন্যতর..53
জাতিকে সমকামিতা পরিহারে লূতের প্রাণান্তকর চেষ্টা..54

সাদুম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লূতের দোয়া 55
লূত আলাইহিস সালাম এর সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ফেরেস্তাদের আগমন 55
যুবকরূপী ফেরেশতাদের সঙ্গে সমকামে উদ্ধৃত 56
ফেরেশতাদের অভয়বাণী এবং এলাকা পরিত্যাগের আদেশ 56
ভয়ঙ্কর আযাবের সম্মুখীন কওমে লূত...57
ফির'আউন...59
ফির'আউনের সীমালঙ্ঘন 59
ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ফির'আউনের নির্মম নির্যাতন ও শিশুহত্যা 59
ফির'আউনের উজির হামান..60
খোদাদ্রোহী ফির'আউনের মুখোমুখি মুসা আলাইহিস সালাম...61
ফির'আউনের করুণ মৃত্যু...63
আমাদের জন্য শিক্ষা 64
অভিশপ্ত জাতি বনি ইসরাঈল 64
বনি ইসরাইলের পরিচয় 65
অবশেষে আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণাম...67
আবরাহা ও হস্তিবাহিনী 68
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর শত্রুদের নির্যাতন ও পরিণাম 69
১. আবু লাহাব ও তার পরিবার কর্তৃক নির্যাতন এবং পরিণতি 71
২. আবু জাহল কর্তৃক অত্যাচার ও পরিণতি 75
৩. খালাফের পুত্রদ্বয়ের কটূক্তি ও নিপীড়ন..80
উপসংহার...83
তথ্যসূত্র: 84

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের জন্য এবং দরুদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর প্রিয় হাবিব রসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট।

এ পৃথিবীতে মানব জাতিকে যে সর্বোচ্চ নেয়ামত দান করে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেছেন তা হচ্ছে ইসলাম। মুসলিম জাতি এ দ্বীনকে অনুসরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করে ধন্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ইসলাম যে মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ নেয়ামত সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, ‘‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আমার নেয়ামতকে তোমাদের প্রতি পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করে দিলাম।’’ (আল-মায়েদাহ-৩) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ‘তিনি তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কষ্ট ও সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মে অটল থাকো। তিনি তোমাদের মুসলিম হিসেবে নামকরণ করেছেন পূর্বে এবং এ কিতাবে যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হয়ে যান এবং তোমরাও সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের প্রভু। আর কতই না উত্তম প্রভু এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী তিনি। (হজ্ব-৭৮) আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এ নেয়ামতের শোকর গোযার হওয়া। যে দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বাছাই করেছেন, তা পালন করা। সেটা হচ্ছে মানব জাতির কাছে সত্যের সাক্ষ্য পেশ করা।ইসলাম শুধু কতগুলো ঠুনকো আক্বীদা বিশ্বাসের নাম নয়। ইসলাম হচ্ছে স্বচ্ছ আকীদা, বিশ্বাস, পরিচ্ছন্ন ও যুক্তসঙ্গত ইবাদত অনুষ্ঠান, সুস্থ ও সাবলীল এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের সমন্বিত প্রয়াস। ইসলাম যে আল্লাহর কত বড় নেয়ামত তা উপলব্ধি করতে হলে তাকিয়ে দেখুন, পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলোর প্রতি। বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও আক্বীদা বিশ্বাস, ইবাদতের অনুষ্ঠান এবং জীবন বিধান ও নৈতিকতার প্রশ্নে যে মানুষ মুর্খতার কত অতল গহবরে নিমজ্জিত। জীবন পরিচালনার নৈতিক ধস নিছক ভোগ ও বস্তুবাদী সভ্য সমাজের মানুষকে বন্য জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে।

তাই ইসলামের নেয়ামতকে উপলব্ধি করতে হবে। এ নেয়ামতের ক্বদর করে শোকার গোযার হতে হবে। ইসলারে সুমহান বাণীকে প্রচার মাধ্যমের ধুম্রজাল ছিন্ন করে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে আস্থা ও আত্মমর্যাদার সাথে। ওমার (রা.) বলেছেন, আমরা সে জাতি, যাদেরকে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা সম্মানে ভূষিত করেছেন। আমরা যদি কখনো ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুতে আমাদের মর্যাদা অন্বেষণ করি, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে অপদস্ত করবেন। সে পরিস্থিতিরই আমরা শিকার হয়ে আছি নিঃসন্দেহে।

আল্লাহ আরও এরশাদ করেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথামতো চলো, তাহলে ওরা তোমাদের পেছনে ফেলে দিবে, তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্য হচ্ছে উত্তম সাহায্য। খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করবো। কারণ ওরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে নিয়েছে যা সম্পর্কে কোন দলিল অবতীর্ণ করা হয়নি। আর ওদের ঠিকানা হলো জাহান্নামের আগুন। বস্তুত যালিমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (আল ইমরান-১৪৯) অত্যাচারী যালিম শাসককে আল্লাহ কখন শাস্তি দেন? অনেকেই মনে করেন জীবনে সফলতা ও কামিয়াবীর উপায় হচ্ছে বস্তুগত উপায়-উপাদান, যেমন- সম্পদের প্রাচুর্য, শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্রের দন্ডমুন্ডের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের সকল সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। কেউ বা আবার ভাবেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বাধুনিক সমাহার, অর্থ, বাণিজ্য, সমর শক্তি ও অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের অধিপতি হয়ে সারাবিশ্বকে হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে নেয়াতেই রয়েছে মানবজীবনের চূড়ান্ত সফলতা। এ জাতীয় দর্শনে বিশ্বাসী লোকেরা তাই যুগে যুগে তাদের উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্য সর্বসাধারণ মানুষকে যুল্ম শোষণে নিষিত করে রেখেছে। কখনো তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হয়েছে, কখনও হয়েছে জাতিগত পর্যায়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। ছোট ছোট জাতিসত্তাকে আক্রমণ, দখল ও শোষণের শিকার বানিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো। কিন্তু আল্লাহর শপথ, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সীমা লঙ্ঘন অব্যাহত রাখলেও শেষ পর্যন্ত আল্লাহর গযবে পাকড়াও হয়েছে তারা। **যুগে যুগে ইসলামের দুশমনদের করুণ পরিণতি ও এ থেকে আমরা যেন শিক্ষা পাই** তার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এসব ঘটনা আমাদেরকে কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে জানিয়েছেন। আমরা যাতে বিপথগামী না হই, ইসলামের দুশমনদের কাতারে যাতে না পরি সেই জন্য এসব ঘটনা সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে তৌফিক দিয়েছেন

এ সম্পর্কে জানার এবং অন্যদের জানানোর এটা আমার জন্য অনেক বড় ইহসান উনার তরফ থেকে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য এই কাজ সম্পন্ন করা সহজ করুন এবং এই গবেষণাপত্রটি আমার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন এই দোআ করি। আল্লাহ আপনি কবুল করুন.....

অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تُنۡذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ٦
خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ وَعَلٰى سَمۡعِهِمۡ‌ؕ وَعَلٰٓى اَبۡصَارِهِمۡ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ٧

নিশ্চিতই যারা অস্বীকারকারী (কাফের) হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সুরা বাক্বারা : আয়াত ৬-৭)

উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ এই নয় যে, আল্লাহ পাক তাদের যাবতীয় শক্তি রহিত করে তাদেরকে হিদায়েত থেকে বঞ্চিত করেছেন; বরং প্রকৃত অবস্থা হলো- মানুষকে আল্লাহ ইচ্ছা শক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন। মানুষ যাতে স্বাধীনভাবে যে কোনো কাজ করতে আল্লাহ পাকের সাহায্য চায়। মানুষের দুনিয়ার এ কর্ম স্বাধীনতা হলো পরীক্ষা ক্ষেত্র। যারা সৎকাজ করবে তারা পুরষ্কৃত হবে, আর মন্দ কাজের জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে ইবনে কাছিরে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, যেন সারা দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দ্বারা ঘোষণা করলেন, ঈমান আনার সৌভাগ্য সবার হবে না। সৃষ্টি হয়ে

স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা, তাঁর অনন্ত অসীম নিয়ামাত ভোগ করে সেই মহান দাতাকে অবিশ্বাস করে, তাঁর দান-অনুগ্রহ ব্যবহারের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি পদ্ধতি মেনে চলতে অস্বীকার করা মানুষের অবনতি-অধ:পতন ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে আল্লাহ বলেন, আপনি যতই সুসংবাদ আর দুঃসংবাদই দেন না কেন, তারা ঈমান আনয়ন করবে না। তারাই কঠিন ও কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে সে কথাই অত্র আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।
শাস্তির ধরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে- প্রত্যেক অবিশ্বাসী কাফেরকে একশত চর্ম প্রদান করা হবে, প্রত্যেক চর্মের উপর বিভিন্ন প্রকার আজাব হতে থাকবে এবং প্রত্যেক দিন ৭০ হাজার বার চর্ম পরিবর্তন করা হবে। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ আয়াতের মর্মার্থ হলো- প্রতি ঘণ্টায় একশত বার দোজখীদের চর্ম পরিবর্তন করা হবে।আয়াতের শিক্ষা যারা স্রষ্টা ও পালনকর্তার পৃথিবীতে বাস করে তারই অস্তিত্বের অস্বীকার করে, তাঁর বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে, স্বীয় দম্ভ ও অহমিকা প্রকাশ করে, তারা মানবতার কলংক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করে। আল্লাহ তাআলা মুসলমান ঈমানদার বান্দাদের কল্যাণে দুনিয়ার সব বিপর্যয়ের মধ্যেও ঈমানের উপর আল্লাহ অস্তিত্বের উপর অটল-অবিচল থাকার জন্য অবিশ্বাসীদের অবস্থা কেমন হবে তা তুলে ধরেছেন। পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকে আল্লাহর অবাধ্যতা করা, ইসলামের দুশমনদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলে গেছেন।

আমাদের সমাজে অন্যায় অপরাধ অত্যাচার জুলুম অনেক বেশি বেড়ে গেছে। মানুষ ভুলে গেছে পরকাল ও জাহান্নামের আগুনকে। অন্যায় অপরাধ ও জুলুমের কারণে আগে বহু জাতিকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দিয়েছেন, ধ্বংস হওয়া বহু জাতির কথা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এসেছে।

নূহ আলাইহিস সালাম

‘সাম আরবের পিতা, হাম হাবশার পিতা এবং ইয়াফেছ রোমকদের (গ্রীক) পিতা’।[5]ইবনু আববাস ও ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, পরবর্তী মানব জাতি সবাই নূহের বংশধর’।[6]

আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ. ‘আমরা তাঁর (নূহের) বংশধরগণকেই অবশিষ্ট রেখেছি’ (ছাফফাত ৩৭/৭৭)।ফলে ইহুদী-খৃষ্টান সহ সকল ধর্মমতের লোকেরা নূহ আলাইহিস সালাম-কে তাদের পিতা হিসাবে মর্যাদা দিয়ে থাকে। সাম ছিলেন তিন পুত্রের মধ্যে বড়। তিনি ছিলেনأبو العرب বা আরব জাতির পিতা। তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই ছিলেন হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইসহাকের বংশধরগণের মধ্যে ছিলেন ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইউনুস, ইলিয়াস, ঈসা আলাইহিমুস সালাম প্রমুখ নবী ও রাসূলগণ। হাম ও ইয়াফেছ-এর বংশধরগণের নিকটে প্রেরিত নবীগণের নাম জানা যায়নি। তবে আরবদের মধ্যকার চারজন নবী ছিলেন হূদ, ছালেহ, শু‘আয়েব আলাইহিমুস সালাম ও মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ।[7] অধিকাংশ সাহাবীর মতে নূহ আলাইহিস সালাম ছিলেন ইদরীস আলাইহিস সালাম-এর পূর্বেকার নবী।[8] তিনিই ছিলেন জগতের প্রথম রাসূল।[9] ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুআত প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত ছিলেন।[10] ফলে সুদীর্ঘকাল যাবত তিনি নবী হিসাবে শিরকে নিমজ্জিত হঠকারী কওমকে দাওয়াত দেন। প্লাবনের পর তাঁর সাথে নৌকারোহী মুমিন নর-নারীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে নতুনভাবে আবাদ শুরু হয় এবং তাদেরকে তিনি সত্যের পথে পরিচালিত করেন। এ কারণে তাঁকে ‘মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা’ বলা হয়।

আদম আলাইহিস সালাম ৯৬০ বছর বেঁচে ছিলেন[11] এবং নূহ আলাইহিস সালাম ৯৫০ বছর জীবন পেয়েছিলেন (আনকাবূত ২৯/১৪)। উল্লেখ্য যে, আদম ও নূহ আলাইহিস সালাম -এর দীর্ঘ বয়স আল্লাহর বিশেষ দান ও তাঁদের মু‘জেযা স্বরূপ ছিল। নূহ আলাইহিস সালাম -এর পুরুষানুক্রমিক বয়স তাঁর ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। নূহ

আলাইহিস সালাম ইরাকের মূছেল নগরীতে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে বসবাস করতেন। তারা বাহ্যতঃ সভ্য হ'লেও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি তাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৮টি সূরায় ৮১টি আয়াতে বর্ণিত আছে।

আদম আলাইহিস সালাম থেকে নূহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। যার শেষদিকে ক্রমবর্ধমান মানবকুলে শিরক ও কুসংস্কারের আবির্ভাব ঘটে এবং তা বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ নূহ আলাইহিস সালাম -কে নবী ও রাসূল করে পাঠান। তিনি সাড়ে নয়শত বছরের দীর্ঘ বয়স লাভ করেছিলেন এবং সারা জীবন পথভোলা মানুষকে পথে আনার জন্য দাওয়াতে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর কওম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আল্লাহর গযবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপরে আরও কয়েকটি কওম আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে পরপর ধ্বংস হয়। এভাবে পৃথিবীতে আদি যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি জাতির ঘটনা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআনের মাধ্যমেই জগদ্বাসী তাদের খবর জানতে পেরেছে। যাতে মুসলিম উম্মাহ ও পৃথিবীবাসী তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। উক্ত ৬টি জাতি হ'ল- কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন। অবশ্য কুরআনে এ তালিকায় কওমে ইবরাহীমের কথাও এসেছে (তওবাহ ৯/৭০)। যদিও তারা একত্রে ধ্বংস হয়নি। তবে ইবরাহীমের ভাতিজা লূত-এর কওম একত্রে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। আমরা এখানে প্রথমে নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর কওম সম্পর্কে আলোচনা করব।

নূহ আলাইহিস সালাম-এর_পরিচয়

‘আবুল বাশার ছানী’ (ابوالبشرالثانى) বা মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা বলে খ্যাত নূহ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দশম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি ছিলেন দুনিয়াতে ১ম রাসূল।[1]

নূহ আলাইহিস সালাম -এর চারটি পুত্র ছিলঃ সাম, হাম, ইয়াফিছ ও ইয়াম অথবা কেন‘আন।[2] প্রথম তিনজন ঈমান আনেন। কিন্তু শেষোক্ত জন কাফের হয়ে প্লাবনে ডুবে মারা যায়। নূহ আলাইহিস সালাম-এর দাওয়াতে তাঁর কওমের হাতেগনা মাত্র কয়েকজন ঈমানদার ব্যক্তি সাড়া দেন এবং তারাই প্লাবনের সময় নৌকারোহণের মাধ্যমে নাজাত পান। নূহের কিশতীতে কয়জন ঈমানদার ব্যক্তি আরোহণ করে নাজাত পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে কুরআনে বা হাদীছে কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি। অমনিভাবে কিশতীটি কত বড় ছিল, কিভাবে ও কত দিনে তৈরী হয়েছিল, এসব বিষয়েও কিছু বর্ণিত হয়নি। এসব বিষয়ে যা কিছু বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে, সবকিছুর ভিত্তি হ’ল ইস্রাঈলী উপকথা সমূহ। যার সঠিক কোন ভিত্তি নেই।[3] ইমাম তিরমিযী হযরত সামুরা (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ’তে সূরা ছাফফাত ৭৭ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, নূহের প্লাবন শেষে কেবল তাঁর তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফেছ-এর বংশধরগণই অবশিষ্ট ছিল।[4] রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন যে,

سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم.

‘সাম আরবের পিতা, হাম হাবশার পিতা এবং ইয়াফেছ রোমকদের (গ্রীক) পিতা’।[5]ইবনু আববাস ও ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, পরবর্তী মানব জাতি সবাই নূহের বংশধর’।[6]

আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ. ‘আমরা তার (নূহের) বংশধরগণকেই অবশিষ্ট রেখেছি’ (ছাফফাত ৩৭/৭৭)।

ফলে ইহুদী-খৃষ্টান সহ সকল ধর্মমতের লোকেরা নূহ আলাইহিস সালাম-কে তাদের পিতা হিসাবে মর্যাদা দিয়ে থাকে। সাম ছিলেন তিন পুত্রের মধ্যে বড়। তিনি ছিলেন أبو العرب বা আরব জাতির পিতা। তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই ছিলেন হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইসহাকের বংশধরগণের মধ্যে ছিলেন ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইউনুস, ইলিয়াস, ঈসা আলাইহিমুস সালাম প্রমুখ নবী ও রাসূলগণ। হাম ও ইয়াফেছ-এর বংশধরগণের নিকটে প্রেরিত নবীগণের নাম জানা যায়নি। তবে আরবদের মধ্যকার চারজন নবী ছিলেন হূদ, ছালেহ, শু'আয়েব আলাইহিমুস সালাম ও মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[7] অধিকাংশ ছাহাবীর মতে নূহ আলাইহিস সালাম ছিলেন ইদরীস আলাইহিস সালাম-এর পূর্বেকার নবী।[8] তিনিই ছিলেন জগতের প্রথম রাসূল।[9] ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত ছিলেন।[10] ফলে সুদীর্ঘকাল যাবত তিনি নবী হিসাবে শিরকে নিমজ্জিত হঠকারী কওমকে দাওয়াত দেন। প্লাবনের পর তাঁর সাথে নৌকারোহী মুমিন নর-নারীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে নতুনভাবে আবাদ শুরু হয় এবং তাদেরকে তিনি সত্যের পথে পরিচালিত করেন। এ কারণে তাঁকে 'মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা' বলা হয়।

আদম আলাইহিস সালাম ৯৬০ বছর বেঁচে ছিলেন[11] এবং নূহ আলাইহিস সালাম ৯৫০ বছর জীবন পেয়েছিলেন (আনকাবূত ২৯/১৪)।
উল্লেখ্য যে, আদম ও নূহ আলাইহিমুস সালাম-এর দীর্ঘ বয়স আল্লাহর বিশেষ দান ও তাঁদের মু'জেযা স্বরূপ ছিল। নূহ আলাইহিস সালাম-এর পুরুষানুক্রমিক বয়স তাঁর ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। নূহ আলাইহিস সালাম ইরাকের মূছেল নগরীতে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে বসবাস করতেন। তারা বাহ্যতঃ সভ্য হ'লেও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি তাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৮টি সূরায় ৮১টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[12]

তথ্যসূত্র :

[1]. মুসলিম হা/৩২৭ ‘ঈমান’ অধ্যায় ৮৪ অনুচ্ছেদ। রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

[2]. কুরতুবী, সূরা আনকাবূত ১৪ আয়াতের ব্যাখ্যা।

[3]. দ্রঃ কুরতুবী টীকা সূরা হূদ ৩৮-৪০ আয়াত।

[4]. তাফসীর ইবনে কাছীর সূরা ছাফফাত ৭৭ আয়াতের ব্যাখ্যা।

[5]. তিরমিযী হা/৩২৩০-৩১; আলবানী সনদ ‘যঈফ’ বলেছেন; আহমাদ হা/১৯৯৮২ তাহকীকঃ হামযাহ আহমাদ; হাকেম ২/৫৪৬ পৃঃ; তিনি একে ‘ছহীহ’ বলেছেন ও যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

[6]. ঐ।

[7]. মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত : মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩), পৃঃ ১৪৩-৪৪, ছহীহ ইবনু হিববান, আবু যর গেফারী হ’তে মরফূ সূত্রে; সনদ যঈফ।

[8]. বাহরে মুহীত-এর বরাতে তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ৪৫২ সূরা আ‘রাফ ৫৯-৬৪ আয়াত।

[9]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭২, ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘হাউয ও শাফা‘আত’ অনুচ্ছেদ।

[10]. কুরতুবী, ইবনু কাছীর; সূরা আনকাবূত ১৪-১৫ আয়াত।

[11]. তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৮ ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ; তিরমিযী অত্র হাদীছকে ‘হাসান ছহীহ’ বলেছেন। অতঃপর ‘সালাম’ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৪৬৬২ নং হাদীছটিকে তিনি ‘হাসান গরীব’ বলেছেন। যেখানে আদম (আঃ)-এর বয়স ৯৪০ বলা হয়েছে। ছাহেবে মিরক্বাত ও ছাহেবে তুহফা প্রথমোক্ত হাদীছকে ‘অগ্রগণ্য’ (أرجح) বলেছেন।

[12]. যথাক্রমে আলে ইমরান ৩/৩৩-৩৪; নিসা ৪/১৬৩; আন‘আম ৬/৬, ৮৪; আ‘রাফ ৭/৫৯, ৬৯, ১৩৩= ৩; তওবা ৯/৭০; ইউনুস ১০/৭১; হূদ ১১/২৫, ৩২, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৮৯= ৮; ইবরাহীম ১৪/৯; ইসরা ১৭/৩, ১৭; মারিয়াম ১৯/৫৮; আম্বিয়া ২১/৭৬; হজ্জ ২২/৪২; মুমিনূন ২৩/২৩; ফুরক্বান ২৫/৩৭; শো‘আরা ২৬/১০৫, ১০৬, ১১৬; আনকাবূত ২৯/১৪-১৫; আহযাব ৩৩/৭; ছাফফাত ৩৭/৭৫, ৭৯; ছোয়াদ ৩৮/১২; গাফের/মুমিন ৪০/৫, ৩১-৩৩= ৪; শূরা ৪২/১৩; ক্বাফ ৫০/১২; যারিয়াত ৫১/৪৬; নাজম ৫৩/৫২; ক্বামার ৫৪/৯-১৬= ৮; হাদীদ ৫৭/২৬; তাহরীম ৬৬/১০; নূহ ৭১/১-২৮= ২৮। সর্বমোট = ৮১ টি

তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

আদম আলাইহিস সালাম-এর সময়ে ঈমানের সাথে শিরক ও কুফরের মুকাবিলা ছিল না। তখন সবাই তওহীদের অনুসারী একই উম্মতভুক্ত ছিল (বাক্বারাহ ২/২১৩)। তাঁর শরী'আতের অধিকাংশ বিধানই ছিল পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষের মধ্য শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে। নূহের কওম ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব ও নাস্র প্রমুখ মৃত নেককার লোকদের অসীলায় আখেরাতে মুক্তি পাবার আশায় তাদের পূজা শুরু করে। এই পূজা তাদের কবরেও হ'তে পারে, কিংবা তাদের মূর্তি বানিয়েও হ'তে পারে। মুহাম্মাদ ইবনু ক্বায়েস বলেন, আদম ও নূহ আলাইহিস সালাম-এর মধ্যবর্তী সময়কালের এই পাঁচজন ব্যক্তি নেককার ও সৎকর্মশীল বান্দা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর ভক্ত অনুসারীগণকে শয়তান এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, এইসব নেককার মানুষের মূর্তি সামনে থাকলে তাদের দেখে আল্লাহর প্রতি ইবাদতে অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ফলে তারা তাদের মূর্তি বানায়। অতঃপর উক্ত লোকদের মৃত্যুর পরে তাদের পরবর্তীগণ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ঐ মূর্তিগুলিকেই সরাসরি উপাস্য হিসাবে পূজা শুরু করে দেয়। তারা এইসব মূর্তির অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত'।[13] আর এভাবেই পৃথিবীতে প্রথম মূর্তিপূজার শিরকের সূচনা হয়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, এই লোকগুলি হযরত নূহ আলাইহিস সালাম-এর যুগের নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের অনুসারীদের এই মর্মে ধোঁকা দিল যে, এঁদের বসার স্থানগুলিতে এক একটি মূর্তি বানালো ও তাদের নামে নামকরণ করলো। লোকেরা তাই করল। ...

এই মূর্তিগুলি পরবর্তীকালে আরবদের মধ্যেও চালু ছিল। 'ওয়াদ' ছিল বনু কালবের জন্য দূমাতুল জান্দালে, সুওয়া' ছিল বনু হোযায়েলের জন্য, ইয়াগূছ ছিল বনু গুত্বায়েফ-এর জন্য জুরুফ নামক স্থানে, ইয়া'ঊক্ব ছিল বনু হামদানের জন্য এবং নাস্র ছিল হিমইয়ার গোত্রের বনু যি-কালা এর জন্য'।[14]

ইবনু আবী হাতেম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ‘ওয়াদ’ ছিল এদের মধ্যে প্রথম এবং সর্বাধিক নেককার ব্যক্তি। তিনি মারা গেলে লোকেরা তার প্রতি ভক্তিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শয়তান এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং লোকদেরকে তার মূর্তি বানাতে প্ররোচনা দেয়। ফলে ওয়াদ-এর মূর্তিই হ’ল পৃথিবীর সর্বপ্রথম মূর্তি, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার পূজা শুরু হয়’।[15]

অতএব পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক হ’ল নেককার মানুষের কবর অথবা তাদের মূর্তিপূজা। যা আজও প্রায় সকল ধর্মীয় সমাজে চালু আছে এবং বর্তমানে যা মুসলিম সমাজে স্থানপূজা, কবর পূজা, ছবি-প্রতিকৃতি, মিনার ও ভাষ্কর্য পূজায় রূপ নিয়েছে। উক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য ও তাদের প্রতি ভক্তি লোকদের হৃদয়ে এমনভাবে প্রোথিত হয়েছিল যে, তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনকালে তাদের নাম উল্লেখ করত। এতদ্ব্যতীত তারা নানাবিধ সামাজিক অনাচারে ডুবে গিয়েছিল। সম্প্রদায়ের এইরূপ পতন দশায় আল্লাহ তাদের হেদায়াতের জন্য নূহ আলাইহিস সালাম কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন (আ‘রাফ ৭/৬১)।

তথ্যসূত্র :

[13]. ইবনু কাছীর, সূরা নূহ। বুখারী মওকুফ সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হ’তে এটি বর্ণনা করেন ‘তাফসীর’ অধ্যায় হা/৪৯২০।
[14]. বুখারী ‘তাফসীর’ অধ্যায় হা/৪৯২০; তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নূহ।
[15]. তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নূহ।

স্বীয় কওমের প্রতি নূহ আলাইহিস সালাম-এর দাওয়াত

আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، يَغْفِرْ لَكُم مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ- (نوح-১-৪)

'আমরা নূহকে তার কওমের নিকটে প্রেরণ করলাম তাদের উপরে মর্মান্তিক আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে সতর্ক করার জন্য'। 'নূহ তাদেরকে বলল, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী'। 'এ বিষয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর'। 'তাতে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, তখন তা এতটুকুও পিছানো হবে না। যদি তোমরা তা জানতে' (নূহ ৭১/১-৪)।

অতঃপর তিনি তাদেরকে শিরক পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদতে ফিরিয়ে আনার জন্য বান্দার উপরে আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ ও অগণিত নে'মতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً، وَاللهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً، وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً- (نوح-১৫-২০)

'তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন'। 'সেখানে তিনি চন্দ্রকে রেখেছেন আলো রূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপ রূপে'। 'আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে উদ্গত করেছেন'। 'অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন ও আবার পুনরুত্থিত করবেন'। 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা সদৃশ'। 'যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত রাস্তাসমূহে' (নূহ ৭১/১৫-২০)।

নূহ আলাইহিস সালাম স্বীয় কওমকে দিন-রাত দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে বিভিন্ন পন্থায় ও পদ্ধতিতে দাওয়াত দেন। কিন্তু ফলাফল হয় নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। তাঁর দাওয়াতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা তাঁকে দেখলেই পালিয়ে যেত। কখনো কানে আঙ্গুল দিত। কখনো তাদের চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলতো। তারা তাদের হঠকারিতা ও যিদে অটল থাকত এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত' (নূহ ৭১/৬-৯)। এক সময় কওমের সর্দাররা লোকদের ডেকে বলল,

وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً وَّلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً- (نوح-২১-২৩)

(খবরদার!) 'তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের পূজিত উপাস্য ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব, নাস্র-কে কখনোই পরিত্যাগ করবে না'। (এভাবে) 'তারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে এবং (তাদের ধনবল ও জনবল দিয়ে) নূহ-এর বিরুদ্ধে ভয়ানক সব চক্রান্ত শুরু করে' (নূহ ৭১/২১-২৩)।

নূহ আলাইহিস সালাম-এর বিরুদ্ধে পাঁচটি আপত্তি

কওমের অবিশ্বাসী নেতারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য নূহ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে পাঁচটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। যথাঃ

(১) আপনি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। নবী হ'লে তো ফেরেশতা হতেন ;
(২) আপনার অনুসারী হ'ল আমাদের মধ্যকার হীন ও কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ;
(৩) কওমের উপরে আপনাদের কোন প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয় না (হূদ ১১/২৭) ;
(৪) আপনার দাওয়াত আমাদের বাপ-দাদাদের রীতি বিরোধী ;
(৫) আপনি আসলে নেতৃত্বের অভিলাষী (মুমিনূন ২৩/২৪-২৫)। অতএব আপনাকে আমরা মিথ্যাবাদী মনে করি (হূদ ১১/২৭)।

জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য নূহ-এর দাওয়াতকে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করে কাফের নেতারা বলল,

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَأَنزَلَ مَلَآئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِيْ آبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ- (المؤمنون-২৪-২৫)

‘এ লোক তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আসলে সে তোমাদের উপরে নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো একজন ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। তাছাড়া এ লোক যেসব কথা বলছে, তাতো আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের কাছে কখনো শুনিনি’। ‘আসলে লোকটার মধ্যে পাগলামী রয়েছে কিংবা তার সাথে কোন জিন রয়েছে। অতএব তোমরা এ ব্যক্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ কর না। বরং কিছুদিন অপেক্ষা কর’ (মুমিনূন ২৩/২৪-২৫)। (এভাবে) ‘তারা তাঁকে সরাসরি পাগল বলে এবং (প্রাণে মারার) হুমকি দেয়’ (ক্বামার ৫৪/৯)।

আপত্তি সমূহের জবাব

(১) গোত্রের নেতাদের উপরোক্ত আপত্তি ও অপবাদ সমূহের জবাবে নূহ আলাইহিস সালাম বলেন,

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ

إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيْ وَآتَانِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ- (هود-২৮)

‘হে আমার কওম! আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ হ’তে স্পষ্ট দলীলের উপরে থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হ’তে আমাকে রহমত দান করেন, আর সেসব থেকে যদি তোমাদের চক্ষু অন্ধ থাকে, তাহ’লে কি আমি তা তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের উপরে চাপিয়ে দিতে পারি? (হূদ ১১/২৮)। একথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, নবুওয়াত ও রিসালাত চেয়ে পাওয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি মানুষের জন্য কোন ফেরেশতাকে নয়, বরং তাঁর মনোনীত কোন মানুষকেই নবী করে পাঠিয়ে

থাকেন স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সহকারে। নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর কওমকে আরও বলেন,

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ- (الأعراف-৬৪)

‘তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে ও তার ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও’ (আ‘রাফ ৭/৬৩)। আল্লাহ বলেন, ‘কিন্তু তারা নূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। তখন আমরা তাকে ও তার নৌকারোহী সাথীদেরকে মুক্ত করি এবং আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপকারীদের ডুবিয়ে মারি। বস্ত্ততঃ তারা ছিল জ্ঞানান্ধ’ (আ‘রাফ ৭/৬৪)।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একদল লোক শেষনবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ‘নূরের নবী’ বলে পরোক্ষভাবে তাঁকে ‘ফেরেশতা নবী’ বানাতে চায়। এভাবে তারা বিগত যুগের কাফিরদের সন্দেহবাদের অনুসরণ করে মাত্র। অথচ আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُوْنَ- (الأنعام-৯)

‘যদি আমরা কোন ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হ’ত। কিন্তু এতেও তারা ঐ সন্দেহই প্রকাশ করত, যা এখন করছে’ (আন‘আম ৬/৯)।

(২) তাদের দ্বিতীয় আপত্তির জবাবে নূহ আলাইহিস সালাম বলেন,

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوْا إِنَّهُم مُّلاَقُوْ رَبِّهِمْ وَلَـكِنِّيْ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُوْنَ، وَيَا قَوْمِ مَن يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ؟- (هود-২৯-৩০)

‘আমি কোন (গরীব) ঈমানদার ব্যক্তিকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার দীদার লাভে ধন্য হবে। বরং আমি তোমাদেরই মূর্খ দেখছি’। ‘হে আমার

কওম! আমি যদি ঐসব লোকদের তাড়িয়ে দেই, তাহ’লে কে আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করবে? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? (হূদ ১১/২৯-৩০; শো‘আরা ২৬/১১১-১১৫)।

(৩) তৃতীয় আপত্তির জবাবে তিনি বলেন,

وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ الله ُخَيْراً اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ- (هود-(৩১

‘তোমাদের দৃষ্টিতে যারা দীনহীন-অবাঞ্ছিত ব্যক্তি তাদেরকে আল্লাহ কোনরূপ কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব’ (হূদ ১১/৩১)।

অতএব দুনিয়াবী প্রাধান্য মূলতঃ কোন প্রাধান্য নয়। পরকালীন উচ্চ মর্যাদাই হ’ল প্রকৃত মর্যাদা।

(৪) চতুর্থ আপত্তির জবাবে তিনি পয়গম্বরসুলভ উত্তর দিয়ে বলেন,

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (الأعراف-(৬২-৬১

‘হে আমার কওম! আমার মধ্যে কোনই পথভ্রষ্টতা নেই। বরং আমি বিশ্বপালকের পক্ষ হ’তে প্রেরিত রাসূল’। ‘আমি তোমাদের নিকটে আমার প্রভুর রিসালাত পৌঁছে দেই এবং আমি তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়ে থাকি। কেননা আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জানো না’ (আ‘রাফ ৭/৬১-৬২)।

অতএব আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাত তথা অহী-র বিধান পালন করা ও তা জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়াই আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য- পিতৃধর্ম পালন করা নয়। বস্ত্ততঃ বাপ-দাদার ধর্মের দোহাই নূহ আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সবাইকে দেওয়া হয়েছিল। আর সেকারণে প্রায় সকল নবীকেই স্ব স্ব জাতির নিকট থেকে চরম নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল।

(৫) অতঃপর নেতৃত্ব লাভের আশায় নূহ আলাইহিস সালাম লোকদের নিকটে দাওয়াত দিচ্ছেন মর্মে তাদের পঞ্চম আপত্তির জবাবে তিনি স্পষ্টভাষায় বলে দেন যে,

وَيَا قَوْمِ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- (الشعراء-(১০৯

‘এই দাওয়াতের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন মাল-দৌলত বা কোন বিনিময় কামনা করি না। আমার পুরষ্কার তো কেবল বিশ্বপালকের (আল্লাহর) নিকটেই রয়েছে’ (শো‘আরা ২৬/১০৯; ইউনুস ১০/৭২; হূদ ১১/২৯)।

বস্ত্ততঃপক্ষে সকল নবীই একথা বলেছেন। শেষনবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে তাঁর কওমের নেতারা যখন নেতৃত্ব গ্রহণের অথবা মাল-দৌলতের বিনিময়ে তাওহীদের দাওয়াত পরিত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, ‘যদি তোমরা আমার ডানহাতে সূর্য ও বামহাতে চন্দ্র এনে দাও, তথাপি আমি যে সত্য নিয়ে আগমন করেছি, তা পরিত্যাগ করব না’ (আর-রাহীক্ব পৃঃ ৯৭)।

বস্ত্ততঃ শিরকের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জন সহজলভ্য হয় বিধায় যুগ যুগ ধরে দুনিয়াপূজারী এক শ্রেণীর বকধার্মিক লোক মূর্তি, কবর ও মাযার নিয়ে পড়ে আছে। লোকেরা তাদেরকে আল্লাহর অলী ভাবে। অথচ ওরা মূলতঃ শয়তানের অলী। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এদের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন,

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-
(إبراهيم-(৩৬

‘হে প্রভু! এ মূর্তিগুলি বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। এক্ষণে যারা আমার অনুগামী হয়েছে, কেবল তারাই আমার দলভুক্ত। আর যারা আমার অবাধ্যতা করেছে (তাদের

ব্যাপারে আপনিই সবকিছু), নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (ইবরাহীম ১৪/৩৬)। নিঃসন্দেহে যারা শেষনবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যিকারের অনুসারী হবে, কেবল তারাই আখেরাতে মুক্তি পাবে। যেহেতু 'শিরকপন্থীদের জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন' (মায়েদাহ ৫/৭২), সেহেতু শিরকের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনকারী লোকেরা এবং মুশরিক ব্যক্তিরা মুখে আল্লাহকে স্বীকার করলেও ওরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। অতএব হে মানুষ! শিরক হ'তে সাবধান হও!

নূহ আলাইহিস সালাম-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি

আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালাম কে সাড়ে নয়শত বছরের সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। তিনি এক পুরুষের পর দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এই আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্লান্তভাবে দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি। মূলতঃ এই সময় নূহ আলাইহিস সালাম-এর কওম জনবল ও অর্থবলে বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখন্ড ও পাহাড়েও তাদের আবাস সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহর চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিকে সাময়িকভাবে অবকাশ দেন (বাক্বারাহ ২/১৫)। নূহের কওম সংখ্যাশক্তি ও ধনাঢ্যতার শিখরে উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তারা নূহ আলাইহিস সালাম-এর দাওয়াতকে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। নূহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে দিবারাত্রি দাওয়াত দেন। কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে অর্থাৎ সকল পন্থা অবলম্বন করে তিনি নিজ কওমকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন (নূহ ৭১/৫-৯)। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, এই সুদীর্ঘ দাওয়াতী যিন্দেগীতে তিনি যেমন কখনো চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি, তেমনি কখনো নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি ছবর করেন। কওমের নেতারা বলল,

قَالُوْا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ- (الشعراء-১১৬)

‘হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে পাথর মেরে তোমার মস্তক চূর্ণ করে দেওয়া হবে’ (শো‘আরা ২৬/১১৬)। তবুও বারবার আশাবাদী হয়ে তিনি সবাইকে দাওয়াত দিতে থাকেন। আর তাদের জন্য দো‘আ করে বলতে থাকেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ إِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা কর। কেননা তারা জানে না’ (তাফসীর কুরতুবী, সূরা নূহ)।

ওদিকে তাঁর সম্প্রদায়ের অনীহা, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য এবং ঔদ্ধত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব বলেন,

ولم يلق نبى من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبى قُتل

‘নিহত কোন নবী ব্যতীত অন্য কোন নবী তার কওমের নিকট থেকে নূহের মত নির্যাতন ভোগ করেননি’ (ইবনু কাছীর, সূরা আ‘রাফ ৫৯-৬২)। বলা চলে যে, তাদের অহংকার ও অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং পাপ ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে এক পর্যায়ে নূহ আলাইহিস সালাম স্বীয় কওমকে ডেকে বললেন,

يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنْظِرُوْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ- (يونس-৭১-৭৩)

‘হে আমার কওম! যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর আয়াত সমূহের মাধ্যমে তোমাদের উপদেশ দেওয়া ভারি বলে মনে হয়, তবে আমি আল্লাহর উপরে ভরসা করছি। এখন তোমরা তোমাদের যাবতীয় শক্তি একত্রিত কর ও তোমাদের শরীকদের সমবেত কর, যাতে তোমাদের মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না থাকে। অতঃপর আমার ব্যাপারে একটা ফায়ছালা করে ফেল এবং আমাকে মোটেও অবকাশ

দিয়ো না'। 'এরপরেও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তবে জেনে রেখ, আমি তোমাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই'। 'কিন্তু তারপরও তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল...' (ইউনুস ১০/৭১-৭৩)। বলা বাহুল্য যে, এটা ছিল কওমের দুরাচার নেতাদের প্রতি নূহ আলাইহিস সালাম-এর ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ, যার মুকাবিলা করা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না।

এ সময় আল্লাহ পাক অহী নাযিল করে বলেন,

أَنَّهُ لَن يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ- (هود-৩৬)

'তোমার কওমের যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনবে না। অতএব তুমি ওদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হয়ো না' (হূদ ১১/৩৬)। এভাবে আল্লাহর অহী মারফত তিনি যখন জেনে নিলেন যে, এরা কেউ আর ঈমান আনবে না। বরং কুফর, শিরক ও পথভ্রষ্টতার উপরেই ওরা যিদ করে থাকবে, তখন নিরাশ হয়ে তিনি প্রার্থনা করলেন,

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوْنِ- (مؤمنون-২৬)

'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সাহায্য কর। কেননা ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে' (মুমিনূন ২৩/২৬)।

فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِيْ وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ- (الشعراء-১১৮)

'অতএব তুমি আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়ছালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথী মুমিনদেরকে তুমি (ওদের হাত থেকে) মুক্ত কর' (শু'আরা ২৬/১১৮)। তিনি স্বীয় প্রভুকে আহবান করে বললেন,

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ- (القمر-১০)

‘আমি অপারগ হয়ে গেছি। এক্ষণে তুমি ওদের বদলা নাও’ (ক্বামার ৫৪/১০)। তিনি অতঃপর চূড়ান্তভাবে বদ দো‘আ করে বললেন,

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا- (نوح-(২৭-২৬

‘হে প্রভু! পৃথিবীতে একজন কাফের গৃহবাসীকেও তুমি ছেড়ে দিয়ো না’। ‘যদি তুমি ওদের রেহাই দাও, তাহ’লে ওরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং ওরা কোন সন্তান জন্ম দিবে না পাপাচারী ও কাফের ব্যতীত’ (নূহ ৭১/২৬-২৭)।

বলা বাহুল্য, নূহ আলাইহিস সালাম-এর এই দো‘আ আল্লাহ সাথে সাথে কবুল করেন। যার ফলে তারা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হ’ল এবং কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় মুমিন নর-নারী মুক্তি পেলেন। বর্তমান পৃথিবীর সবাই তাদের বংশধর। আল্লাহ বলেন,

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوْرا-ً

‘তোমরা তাদের বংশধর, যাদেরকে আমরা নূহের সাথে (নৌকায়) সওয়ার করিয়েছিলাম। বস্ত্ততঃ সে ছিল একজন কৃতজ্ঞ বান্দা’ (ইসরা ১৭/৩; ছাফফাত ৩৭/৭৭)।

নূহ আলাইহিস সালাম-এর প্লাবন ও গযবের কুরআনী বিবরণ

এ বিষয়ে সূরা হূদে পরপর ১২টি আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন, চূড়ান্ত গযব আসার পূর্বে আল্লাহ নূহ আলাইহিস সালাম-কে বললেন,

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِنَّهُم مُّغْرَقُوْنَ، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ
وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ،
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ
التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا
آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ، وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَهِيَ
تَجْرِي بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن
مَّعَ الْكَافِرِينَ، قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ
مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي
وَغِيْضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَنَادَى نُوحٌ
رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ
لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ
الْجَاهِلِينَ، قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن
مِّنَ الْخَاسِرِينَ، قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ
ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ- (هود-৩৭-৪৮)

‘তুমি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশনা মোতাবেক একটা নৌকা তৈরী কর এবং (স্বজাতির প্রতি দয়া পরবশ হয়ে) যালেমদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলো না। অবশ্যই ওরা ডুবে মরবে’ (হূদ ১১/৩৭)। আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর নূহ নৌকা তৈরী শুরু করল। তার কওমের নেতারা যখন পাশ দিয়ে যেত, তখন তারা তাকে বিদ্রুপ করত। নূহ তাদের বলল, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে জেনে রেখো তোমরা যেমন আমাদের উপহাস করছ, আমরাও তেমনি তোমাদের উপহাস করছি’ (৩৮)। ‘অচিরেই তোমরা জানতে পারবে লাঞ্ছনাকর আযাব কাদের উপরে আসে এবং কাদের উপরে নেমে আসে চিরস্থায়ী গযব’ (৩৯)। আল্লাহ বলেন, ‘অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেল এবং চুলা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, (অর্থাৎ রান্নার চুলা হ’তে পানি উথলে উঠলো), তখন আমি বললাম, সর্বপ্রকার জোড়ার দু’টি করে এবং যাদের উপরে পূর্বেই হুকুম নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাদের বাদ দিয়ে তোমার পরিবারবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নাও। বলা বাহুল্য, অতি অল্প সংখ্যক লোকই তার সাথে

ঈমান এনেছিল' (৪০)। 'নূহ তাঁদের বলল, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (৪১)। 'অতঃপর নৌকাখানি তাদের বহন করে নিয়ে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝ দিয়ে। এ সময় নূহ তার পুত্রকে (ইয়ামকে) ডাক দিল- যখন সে দূরে ছিল, হে বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর, কাফেরদের সাথে থেকো না' (৪২)। 'সে বলল, অচিরেই আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব। যা আমাকে প্লাবনের পানি হ'তে রক্ষা করবে'। নূহ বলল, 'আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কারু রক্ষা নেই, একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন সে ব্যতীত। এমন সময় পিতা-পুত্র উভয়ের মাঝে বড় একটা ঢেউ এসে আড়াল করল এবং সে ডুবে গেল' (৪৩)। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হ'ল, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল (অর্থাৎ হে প্লাবনের পানি! নেমে যাও)। হে আকাশ! ক্ষান্ত হও (অর্থাৎ তোমার বিরামহীন বৃষ্টি বন্ধ কর)। অতঃপর পানি হরাস পেল ও গযব শেষ হ'ল। ওদিকে জূদী পাহাড়ে গিয়ে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হ'ল, যালেমরা নিপাত যাও' (৪৪)। 'এ সময় নূহ তার প্রভুকে ডেকে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার পুত্র তো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আর তোমার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য, আর তুমিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফায়ছালাকারী (৪৫)। 'আল্লাহ বললেন, হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার। তুমি আমার নিকটে এমন বিষয়ে আবেদন কর না, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যেন জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' (৪৬)। 'নূহ বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অজানা বিষয়ে আবেদন করা হ'তে আমি তোমার নিকটে পানাহ চাচ্ছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর ও অনুগ্রহ না কর, তাহ'লে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' (৪৭)। 'বলা হ'ল, হে নূহ! এখন (নৌকা থেকে) অবতরণ কর আমাদের পক্ষ হ'তে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি সহকারে তোমার উপর ও তোমার সঙ্গী দলগুলির উপর এবং সেই (ভবিষ্যৎ) সম্প্রদায়গুলির উপর- যাদেরকে আমরা সত্বর সম্পদরাজি দান করব। অতঃপর তাদের উপরে আমাদের পক্ষ হ'তে মর্মান্তিক আযাব স্পর্শ করবে' (হূদ ১১/৩৭-৪৮)।

মাক্কী জীবনের চরম আতংক ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সূরা হূদ নাযিল করে সেখানে যথাক্রমে নূহ, হূদ, ছালেহ, ইব্রাহীম, লূত, শু'আয়েব ও মূসা আলাইহিমুস সালাম প্রমুখ বিগত নবী ও রাসূলগণের ও তাদের সম্প্রদায়ের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়েছেন। যেমন প্রথমে নূহ আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী বর্ণনা শেষে আল্লাহ বলেন,

تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ- (هود-৪৯)

'এটি গায়েবের খবর যা আমরা আপনার নিকটে অহী করেছি। যা ইতিপূর্বে আপনি বা আপনার সম্প্রদায় জানতো না। অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহভীরুদের জন্যই' (হূদ ১১/৪৯)।

বস্তুতঃ কুরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীবাসী সর্বপ্রথম বিগত যুগের এই সব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির খবর জানতে পেরেছে।

অন্যান্য বিবরণ

সূরা হূদে বর্ণিত উপরোক্ত আয়াত সমূহে নূহ আলাইহিস সালাম-এর প্লাবনের নাতিদীর্ঘ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। কুরআন তার বাকরীতি অনুযায়ী কেবল প্রয়োজনীয় কথাগুলিই বলে দিয়েছে। বাদবাকী ব্যাখ্যা সমূহ মোটামুটি নিম্নরূপঃ

(১) কিশতী : নূহ আলাইহিস সালাম-কে যখন নৌকা তৈরীর নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, তৈরী করতেও জানতেন না। আর সেকারণেই আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, 'তুমি নৌকা তৈরী কর আমাদের চোখের সম্মুখে ও আমাদের অহী অনুসারে' (হূদ ১১/৩৭; মুমিনূন ২৩/২৭)। এর দ্বারা বুঝা যায়. যে, নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ ও নির্মাণ কৌশল জিবরীল (আঃ) নূহ আলাইহিস সালাম -কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এভাবে সরাসরি অহীর মাধ্যমে নূহ আলাইহিস সালাম-এর হাতে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামাল ও যাত্রী পরিবহনে নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। আধুনিক বিশ্ব সভ্যতা যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

একথা ধারণা করা মোটেই অমূলক হবে না যে, উক্ত নৌকা তৈরী করতে নূহ আলাইহিস সালাম-এর বহুদিন সময় লেগেছিল। নৌকাটি অবশ্যই বিরাটায়তনের ছিল। যাতে মানুষ, পশু ও পাখি পৃথকভাবে থাকতে পারে। কিন্তু এজন্য নৌকাটি কয় তলা বিশিষ্ট ছিল, কি কাঠের ছিল, কত গজ লম্বা ও চওড়া ছিল, এসব কাহিনীর কোন সঠিক ভিত্তি নেই। নদীবিহীন মরু এলাকায় বিনা কারণে নৌকা তৈরী করাকে পশুশ্রম ও নিছক পাগলামি বলে 'কওমের নেতারা নূহ আলাইহিস সালাম-কে ঠাট্টা করত' (হূদ ৩৮)। এ ব্যাপরে নূহ আলাইহিস সালাম বলতেন, তোমাদের ঠাট্টার জবাব সত্বর তোমরা জানতে পারবে (হূদ ৩৯)। দীর্ঘ দিন ধরে নৌকা তৈরী শেষ হবার পরেই আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়ছালা নেমে আসে এবং গযবের প্রাথমিক আলামত হিসাবে চুলা থেকে পানি বের হ'তে থাকে।

(২) তান্নূর ও তূফান : 'তান্নূর' বলা হয় মূলতঃ উনুন বা চুলাকে। এটি অনারব শব্দ, যাকে আরবী করা হয়েছে (কুরতুবী)। সহজ-সরল ও প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী ইরাকের মূছেল নগরীতে অবস্থিত নূহ আলাইহিস সালাম-এর পারিবারিক চুলা থেকে পানি উথলে বের হওয়ার আলামতের মাধ্যমেই নূহের তুফানের সূচনা হয়। অর্থাৎ এটি ছিল প্লাবনের প্রাথমিক আলামত মাত্র (কুরতুবী)। 'তূফান' অর্থ যেকোন বস্তুর অত্যাধিক্য। প্লাবনকে 'তূফান' বলা হয় পানির আধিক্যের কারণে, যা সব কিছুকে ডুবিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, 'আমরা নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট। সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাযার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর তাদেরকে 'তূফান' (অর্থাৎ মহাপ্লাবন) গ্রাস করেছিল। আর তারা ছিল অত্যাচারী (আনকাবূত ২৯/১৪)। যদিও অনেকে এর নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যার সবকিছুই ইস্রাঈলিয়াত এবং ভিত্তিহীন।[16]

ভূতলের উত্থিত পানি ছাড়াও তার সাথে যুক্ত হয়েছিল অবিরাম ধারে আকাশবন্যা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল এবং চুলা উচ্ছ্বসিত হ'ল (অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ পানিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠল)-(হূদ ৪০)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْناً فَالْتَقَى الْمَاءَ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ، وَلَقَدْ تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ-

‘তখন আমরা খুলে দিলাম আকাশের দুয়ার সমূহ প্রবল বারিপাতের মাধ্যমে’। ‘এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম নদী সমূহকে। অতঃপর উভয় পানি মিলিত হ’ল একটি পূর্ব নির্ধারিত কাজে (অর্থাৎ ডুবিয়ে মারার কাজে)’। ‘আমি নূহকে আরোহন করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে’। ‘যা চলত আমার দৃষ্টির সম্মুখে। এটা তার (অর্থাৎ আল্লাহর) পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল’। ‘আমরা একে নিদর্শন হিসাবে রেখে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি’? (ক্বামার ৫৪/১১-১৫)। যে কারণে নূহ-পুত্র ‘ইয়াম’ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েও রেহাই পায়নি (হূদ ৪৩)। ঐ সময় কোন কোন ঢেউ পাহাড়ের চূড়া হ’তেও উঁচু ছিল। অতঃপর প্লাবন বিধ্বংসীরূপ ধারণ করে এবং পাহাড়ের মত ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে নৌকা চলতে থাকে’ (হূদ ৪২)।

২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সাগরতলে সংঘটিত ভূমিকম্পের সুনামিতে উত্থিত ৩৩ ফুট উঁচু ঢেউ নূহের তূফানকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

[16]. কুরতুবী, হূদ ৪০ আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।

নৌকার আরোহীগণ

তূফানের আলামত প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে নূহ আলাইহিস সালাম-কে হুকুম দেওয়া হ’ল,

قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

‘জোড় বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণীর এক এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নাও’ (হূদ ১১/৪০; মুমিনূন ২৩/২৭)। এর দ্বারা কেবল ঐসব প্রাণী বুঝানো হয়েছে, যা নর ও মাদীর মিলনে জন্মলাভ করে এবং যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অতীব প্রয়োজনীয়। যেমন গরু-ছাগল, ঘোড়া-গাধা ও হাঁস-মুরগী ইত্যাদি পশু-পক্ষী।

এরপর নূহ আলাইহিস সালাম-কে নির্দেশ দেওয়া হয় কেবল তাঁর পরিবারসহ ঈমানদার নর-নারীকে নৌকায় তুলে নিতে। যাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য ছিল (হূদ ৪০)। কিন্তু সঠিক সংখ্যা কুরআন বা হাদীছে উল্লেখিত হয়নি। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)

হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন করে পুরুষ ও নারী মোট আশি জন। প্লাবনের পর তারা ইরাকের মূছেল নগরীর যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা ‘ছামানূন’ বা আশি নামে খ্যাত হয়ে যায়।[17] প্লাবনে মুক্তিপ্রাপ্তদের ‘সূমর’ (سومر) জাতি বলা হ’ত। ‘জূদী’ (جودى) পাহাড়ে গিয়ে নৌকা নোঙর করে (হূদ ১১/৪৪)। এ পাহাড়টি আজও ঐ নামেই পরিচিত। এটি নূহ আলাইহিস সালাম-এর মূল আবাস ভূমি ইরাকের মূছেল নগরীর উত্তরে ‘ইবনে ওমর’ দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত। বস্তুতঃ এটি একটি পবর্তমালার অংশ বিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম ‘আরারাত’ পর্বত। প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে যে, ইরাকের বিভিন্ন স্থানে উক্ত কিশতীর ভগ্ন টুকরা সমূহ অনেকের কাছে সংরক্ষিত আছে। যা বরকত মনে করা হয় এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যধিতে আরোগ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

উল্লেখ্য যে, নূহের পুত্র কাফিরদের দলভুক্ত হওয়ায় মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু নূহের স্ত্রী সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। এতে স্পষ্ট হয় যে, তিনি আগেই মারা গিয়েছিলেন (ইবনু কাছীর, হূদ ১১/৪০)। তিনি গোপনে কুফরী পোষণ করতেন ও কাফিরদের সমর্থন করতেন। নূহের স্ত্রী ও লূত্বের স্ত্রী স্ব স্ব স্বামীর নবুঅতের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে খেয়ানত করেছিল বলে স্বয়ং আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। নবীদের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কুফরীর কারণে তারা জাহান্নামবাসী হয়েছেন (তাহরীম ৬৬/১০)। সম্ভবতঃ মহাপ্লাবনের সময় নূহের স্ত্রী জীবিত ছিলেন না। সেকারণ গযবের ঘটনা বর্ণনায় কেবল পুত্র ইয়ামের কথা এসেছে। কিন্তু তার মায়ের কথা আসেনি।

[17]. কুরতুবী, ইবনু কাছীর; হূদ ৪০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা অবাধ্যদের ধ্বংস করেছেন।।

আদ জাতি

ইতিহাসের শক্তিশালী গোত্রগুলোর মধ্যে একটি ছিল আদ গোত্র। মাত্র ১৩ পরিবারের গোত্র হলেও ব্যাপক এলাকাজুড়ে ছিল তাদের অবস্থান। তাদের বসতি ছিল আম্মান থেকে শুরু করে হাজরামাউত ও ইয়ামান পর্যন্ত।

সে সময়ের অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামলে ভরপুর ছিল তাদের তাদের খেত-খামার। সব ধরনের বাগ-বাগিচাও ছিল তাদের। তাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসের কারণে অন্য সবার চেয়ে তারা ছিল স্বতন্ত্র এক জাতি। আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারিমের একাধিক স্থানে তাদের এ বিষয়গুলো ওঠে এসেছে-

اَلَمۡ تَرَ كَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعَادٍ - اِرَمَ ذَاتِ الۡعِمَادِ - الَّتِیۡ لَمۡ یُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِی الۡبِلَادِ

তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক আদ জাতির সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছিলেন; সুদীর্ঘ দেহের অধিকারী ইরাম (আদ) গোত্রের সঙ্গে? যার সমতুল্য (এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী) জাতি এর আগে অন্য কোনো দেশে (পৃথিবীতে) সৃষ্টি হয়নি।’ (সুরা ফাজর : আয়াত ৬-৮)

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুকাতিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাদের সৃষ্টি সম্পর্কে একটি ইসরায়েলি বর্ণনা এভাবে তুলে ধরেছেন যে, ‘তাদের উচ্চতা ছিল ১৮ ফুট (১২ হাত)।

আদ জাতির প্রতি আল্লাহর নির্দেশ

অন্য আয়াতে কাওমে নুহের পর তাদের প্রতি করণীয় প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আরো ঘোষণা করেন-

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ زَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে; যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে? স্মরণ কর! আল্লাহ তোমাদেরকে নুহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের (আদ জাতির) অবয়ব ও শক্তিতে (অন্য লোক অপেক্ষা অধিকতর) সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।' (সুরা আরাফ : আয়াত ৬৯)

হজরত নুহ আলাইহিস সালামের পর আল্লাহ তাআলা আদ জাতির কাছে হজরত হুদ আলাইহিস সালামকে দিকনির্দেশনাসহ নবি হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। কোরআনুল কারিমে আল্লাহ ঘোষণা দেন-

وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

'আদ জাতির কাছে ওদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (কেবল) আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো (সত্যিকার) উপাস্য নেই, তোমরা কি সাবধান হবে না?' (সুরা আরাফ, আয়াত : ৬৫)

আয়াতে ঘোষিত এই আদ সম্প্রদায় হল প্রথম আদ। যাদের বাসস্থান ইয়ামানের বালুময় পাহাড়ে ছিল। আর শক্তি-সামর্থ্যে তারা ছিল অতুলনীয়। তাদের নিকট হুদ আলাইহিস সালাম নবী হয়ে এসেছিলেন; যিনি তাদেরই মধ্যেকার একজন ছিলেন।

আদ জাতির ধ্বংসের কারণ

এই আদ জাতি ছিল মূর্তিপূজারী। মূর্তিপূজাসহ তারা আরো নানা অপকর্মে লিপ্ত ছিল। হজরত হুদ আলাইহিস সালাম তাদের মূর্তিপূজা ছেড়ে আল্লাহর একত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং সব ধরনের অত্যাচার-উৎপীড়ন বর্জন করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে বলেছিলেন। কিন্তু তারা নিজেদের ধনৈশ্বর্যের মোহে নিমজ্জিত হয়ে তাঁর (হুদ আলাইহিস সালাম) আদেশ অমান্য করে। সুরা আরাফে তা ধারাবাহিকভাবে ওঠে এসেছে এভাবে-

قَالَ الۡمَلَاُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ قَوۡمِہٖۤ اِنَّا لَنَرٰىکَ فِیۡ سَفَاهَۃٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّکَ مِنَ الۡکٰذِبِیۡنَ

‘তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা বলেছিল, ‘আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো একজন মিথ্যাবাদী মনে করি।’ (সুরা আরাফ : আয়াত ৬৬)

قَالَ یٰقَوۡمِ لَیۡسَ بِیۡ سَفَاهَۃٌ وَّ لٰکِنِّیۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ

‘সে (হুদ আলাইহিস সালাম) বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, আমি তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের (প্রেরিত) একজন রাসুল।’ (সুরা আরাফ : আয়াত ৬৭)

اُبَلِّغُکُمۡ رِسٰلٰتِ رَبِّیۡ وَ اَنَا لَکُمۡ نَاصِحٌ اَمِیۡنٌ

‘আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী (উপদেষ্টা)।’ (সুরা আরাফ : আয়াত ৬৮)

اَوَ عَجِبۡتُمۡ اَنۡ جَآءَکُمۡ ذِکۡرٌ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ عَلٰی رَجُلٍ مِّنۡکُمۡ لِیُنۡذِرَکُمۡ ؕ وَ اذۡکُرُوۡۤا اِذۡ جَعَلَکُمۡ خُلَفَ

آءَ مِنۡۢ بَعۡدِ قَوۡمِ نُوۡحٍ وَّ زَادَکُمۡ فِی الۡخَلۡقِ بَصۜۡطَۃً ۚ فَاذۡکُرُوۡۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

‘তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে; যাতে সে তোমাদের সতর্ক

করে? স্মরণ কর! আল্লাহ তোমাদেরকে নুহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের (আদ জাতির) অবয়ব ও শক্তিতে (অন্য লোক অপেক্ষা অধিকতর) সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।' (সুরা আরাফ : আয়াত ৬৯)

قَالُوۡۤا اَجِئۡتَنَا لِنَعۡبُدَ اللّٰهَ وَحۡدَهٗ وَ نَذَرَ مَا كَانَ یَعۡبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِیۡنَ

'তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছে যে, আমরা যেন শুধু আল্লাহর উপাসনা করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার উপাসনা করতো তা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে (আযাবের) ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।' (সুরা আরাফ : আয়াত ৭০)

অত:পর আদ জাতির প্রতি শাস্তি...

আদ জাতি তাদের নবী হজরত হুদ আলাইহিস সালামের কথা অমান্য করে পাপাচারে লিপ্ত থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা আদ জাতিকে ধ্বংস করে দেন। তাদের প্রতি প্রথম আজাব ছিল অনাবৃষ্টি। তিন বছর তাদের এলাকায় বৃষ্টি বন্ধ ছিল।

এতে তাদের সব ফসল জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। ফলে দেশে অভাব দেখা দেয়। এরপরও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেনি। তারপর আট দিন সাত রাত তাদের ওপর দিয়ে বয়ে যায় প্রবল ঘূর্ণিঝড়। এতে তাদের বাড়ি-ঘর, বাগ-বাগিচা, জীবজন্তু সব ধ্বংস হয়ে যায়। তারা নিজেরাও শূন্যে উড়তে থাকে। রাতে তারা মরে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

قَالَ قَدۡ وَقَعَ عَلَیۡكُمۡ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ رِجۡسٌ وَّ غَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوۡنَنِیۡ فِیۡۤ اَسۡمَآءٍ سَمَّیۡتُمُوۡهَاۤ اَنۡتُمۡ وَ اٰبَآؤُكُمۡ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنۡ سُلۡطٰنٍ ؕ فَانۡتَظِرُوۡۤا اِنِّیۡ مَعَكُمۡ مِّنَ الۡمُنۡتَظِرِیۡنَ

'(হুদ) বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের উপর নির্ধারিত হয়েই আছে, তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে, যার নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছে এবং সে সম্বন্ধে

আল্লাহ কোনো সনদ (স্বীকৃতি) পাঠাননি? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' (সুরা আরাফ : আয়াত ৭১)

আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তোমরা কাউকে বৃষ্টির দেবতা, কাউকে বায়ুর দেবতা, কাউকে ধন-সম্পদের দেবতা, আবার কাউকে রোগের দেবতা বলে থাকো। অথচ তাদের কেউ মূলত কোনো জিনিসের স্রষ্টা ও প্রতিপালক নয়।

মানুষের জন্য আরও সতর্কতা যে-

বর্তমান যুগেও এসবের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এ যুগেও লোকেরা কাউকে বিপদ মোচনকারী বলে থাকে। অথচ বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতাই তার নেই। লোকেরা কাউকে গনজ বখশ (গুপ্ত ধন ভান্ডার দানকারী) বলে অভিহিত করে থাকে। অথচ তার কাছে কাউকে দান করার মত কোনো ধনভান্ডার নেই।

কাউকে 'গরীব নওয়াজ' আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। অথচ তিনি নিজেই গরীব। যে ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ফলে কোনো গরীবকে প্রতিপালন ও তার প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে সেই ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে তার কোনো অংশই নেই।

আবার কাউকে 'গাউস' (ফরিয়াদ শ্রবণকারী) বলা হয় অথচ কারোর ফরিয়াদ শোনার এবং তার প্রতিকার করার কোনো ক্ষমতাই তার নেই। কাজেই এ ধরনের যাবতীয় নাম বা উপাধি নিছক নাম বা উপাধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ নামগুলোর পেছনে কোনো সত্তা বা ব্যক্তিত্ব নেই। যারা এগুলো নিয়ে ঝগড়া ও বিতর্ক করে তারা আসলে কোনো বাস্তব জিনিসের জন্য নয়, বরং কেবল কতিপয় নামের জন্যই ঝগড়া ও বিতর্ক করে।

আদ জাতির প্রতি আল্লাহ আযাব প্রেরণ...

মহান আল্লাহ তাআলা হজরত নুহ আলাইহিস সালামের পর হজরত হুদ আলাইহিস সালামের বিরোধিতাকারীরা তাঁকে অস্বীকার করে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। যার ফলে মহান আল্লাহ পৃথিবীর সেরা শক্তিধর আদ জাতিকে এভাবে ধ্বংস করেন। আর হুদ আলাইহিস সালাম ও তাঁর অনুসারী মুমিনদের এসব আজাব থেকে রক্ষা করেন। আজও আদ জাতির এলাকা মরুভূমি আর মরুভূমিতে পরিণত হয়ে আছে। এ কথাটি আল্লাহ তাআলা এভাবে তুলে ধরেন-

فَاَنۡجَیۡنٰهُ وَ الَّذِیۡنَ مَعَهٗ بِرَحۡمَۃٍ مِّنَّا وَ قَطَعۡنَا دَابِرَ الَّذِیۡنَ کَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَ مَا کَانُوۡا مُؤۡمِنِیۡنَ

‘এরপর তাকে (হুদ আলাইহিস সালাম) ও তার সঙ্গীদেরকে আমার দয়াতে উদ্ধার করেছিলাম এবং আমার নিদর্শনসমূহকে যারা (আদ জাতি) মিথ্যা মনে করেছিল এবং যারা অবিশ্বাসী ছিল তাদেরকে নির্মূল (ধ্বংস) করেছিলাম।’ (সুরা আরাফ : আয়াত ৭২)

ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক (রহ.) লিখেছেন, আদ জাতির অমার্জনীয় হঠকারিতার ফলে প্রাথমিক আজাব হিসেবে উপর্যুপরি তিন বছর বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়। বাগবাগিচা জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।
তা সত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেনি। তারা বাধ্য হয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে। তখন আসমানে সাদা, কালো ও লাল মেঘ দেখা দেয়। একপর্যায়ে গায়েবি আওয়াজ আসে যে তোমরা কোন ধরনের মেঘ পছন্দ করো? লোকেরা কালো মেঘ কামনা করে।তখন কালো মেঘ নেমে আসে। আদ জাতি তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, ‘এটি আমাদের বৃষ্টি দেবে।’ জবাবে তাদের নবী হুদ আলাইহিস সালাম বললেন, ‘বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা এমন বায়ু, যার মধ্যে রয়েছে মর্মন্তুদ আজাব।’ পরদিন ভোরে আল্লাহর চূড়ান্ত আজাব নেমে আসে।

সাত রাত ও আট দিন ধরে অনবরত ঝড়-তুফান বইতে থাকে। মেঘের বিকট গর্জন ও বজ্রপাতে বাড়িঘর ধসে যায়। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে গাছপালা উপড়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে জমিনে পতিত হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা

ইরশাদ করেন, 'আর আদ জাতি, তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়ে। তিনি (আল্লাহ) তা তাদের ওপর বিরামহীন প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন। তখন তুমি (সেখানে উপস্থিত থাকলে) দেখতে, তারা সেখানে পড়ে আছে সারশূন্য খেজুরকাণ্ডের মতো। তাদের কাউকে কি (বর্তমানে) তুমি দেখতে পাও?' (সুরা : হাক্কা, আয়াত : ৬-৮)

এভাবেই শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী আদ জাতি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শক্তি ও ক্ষমতার বাহাদুরি তাদের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে। অনায়াসেই তারা বলে বেড়াত, '(এ দুনিয়ায়) আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে?' কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে তারাও উপলব্ধি করতে পারে যে আল্লাহর হুকুমের সামনে, প্রকৃতির প্রতিশোধের কাছে মানুষ বড় অসহায়। আত্ম-অহমিকা আদ জাতিকে পরকালের ব্যাপারে উদাসীন করে তোলে। তারা বলতে থাকে, 'একমাত্র দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন। আমরা মরি-বাঁচি এখানেই। আর আমরা পুনরায় উত্থিত হব না।' (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ৩৭)

আদ জাতির সুউচ্চ প্রাসাদ ও টাওয়ার ছিল। কিন্তু সেগুলোও তাদের প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করতে পারেনি। আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি দেখোনি, তোমার প্রতিপালক আদ জাতির ইরাম গোত্রের প্রতি কী (আচরণ) করেছেন—যারা ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী? যার সমতুল্য (প্রাসাদ) কোনো দেশে নির্মিত হয়নি।' (সুরা : ফাজর, আয়াত : ৬-৮)

আজাব নাজিলের প্রাক্কালেই আল্লাহ তাআলা হুদ আলাইহিস সালাম ও তাঁর ইমানদার সঙ্গীদের ওই এলাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁরা আজাব থেকে রক্ষা পান। তারপর হুদ আলাইহিস সালাম মক্কায় চলে যান। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। (তাফসির কুরতুবি, আরাফ : ৬৫) তবে আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) হজরত আলী (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে হুদ (আ.) ইয়েমেনেই কবরস্থ হয়েছেন। (তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আরাফ : ৬৫) আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সামুদ জাতি

পৃথিবীর মধ্যে একসময় সামুদ জাতি অর্থশালী ও শক্তিশালী ছিল। তাদের সুখ-শান্তি কোনো কিছুর কমতি ছিল না, তারা বড় বড় প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে দালানকোঠা নির্মাণ করত। তারা শিল্প ও নকশা করে পাথর দিয়ে খুব সুন্দর করে প্রাসাদ নির্মাণ করত। কিন্তু তারা মহান সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়ে শুরু করে দিয়েছিল পাথর পূজা, মূর্তির পূজা ও দেব-দেবীর পূজা, তাদের মধ্যে বেড়ে গিয়েছিল অন্যায় অপরাধ ও জুলুম নির্যাতন। আদ জাতি ধ্বংস হওয়ার ৫০০ বছর পরে এই পথভ্রষ্ট সামুদ জাতিকে আসমানি ধর্ম পালন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা একজন তাঁর মনোনীত নবী পাঠিয়েছেন হজরত সালেহ আ:-কে।
আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইরশাদ করেন- 'আমি সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো; কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো।' (সূরা নামল-৪৫)

আল্লাহ সর্বযুগে বান্দার হেদায়াতের জন্য নবী-রাসুলদের পাঠিয়েছেন। তেমনি সামুদ একটি জাতির নাম। তাদের হেদায়াতের জন্য সালেহ আলাইহিস সালাম-কে নবীরূপে প্রেরণ করেন। সালেহ আলাইহিস সালাম বংশ ও জন্মগতভাবে সামুদ জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সালেহ আলাইহিস সালাম তার জাতিকে এই মর্মে দাওয়াত দিয়েছেন 'তোমরা আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নাও এবং এ কথার বিশ্বাস কর, তিনি ছাড়া উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত কেউ নয়।' কোরআনে বর্ণিত আছে, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মাবুদ (উপাস্য) নেই। তিনিই তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং জমিনে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এরপর তাওবা কর। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক নিকটবর্তী ও কবুলকারী।' (সুরা হুদ : ৬১)।

এটি আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় জাতি। আদের পরে এরাই সবচেয়ে বেশী খ্যাতি ও পরিচিত অর্জন করে। কোরআন নাজিলের পূর্বে এদের কাহিনী সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

সামুদ জাতি ছিল হযরত নূহ আলাইহিস সালাম-এর অধস্তন পুরুষ সামুদের বংশধর। সামুদের নামেই এ জাতির নামকরণ করা হয়েছে। উত্তর পশ্চিম আরবের আল হাজার নামক স্থানে ছিল তাদের বসতি। তথায় এখনো তাদের ধ্বংসস্তূপের নিদর্শনাবলি বিদ্যমান রয়েছে। আজও আরবের ইতিহাসে সামুদ জাতি ধিকৃত হিসেবে স্বীকৃত। আলহাজর স্থানটিকে আরবের লোকজন অভিশপ্ত জায়গা বলে মনে করে থাকে। পাহাড় খোদাই করে তারা তাদের গৃহনির্মাণ করেছে। উক্ত নিদর্শনাবলি থেকে অনুমান করা যায়, এক কালে এটা লক্ষ লক্ষ লোকের কোলাহলে মুখরিত ছিল।

জাহেলী যুগের কবিতা, ও খুতবা সাহিত্যে এর ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়। আসিরিয়ার শিলালিপি, গ্রীস, ইসকানদারীয়া ও রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভুগোলবিগণও এর উল্লেখ করেছেন। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের কিছুকাল পুর্বে ও এ জাতির কিছু কিছু লোক বেঁচেছিল। রোমীয় ঐতিহাসিকগণের মতে, এরা রোমীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে এদের শত্রু নিবতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। উত্তর পশ্চিম আরবের যে এলাকটি আজো 'আল হিজর' নামে খ্যাত সেখানেই ছিল এদের আবাস। আজকের সউদী আরবের অন্তর্গত মদীনা ও তাবুকের মাঝখানে হিজায রেলওয়ের একটি ষ্টেশন রয়েছে, তার নাম মাদায়েনে সালেহ। এটিই ছিল সামুদ জাতির কেন্দ্রীয় স্থান। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল হিজর।সামুদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে যেসব বিপুলায়তন ইমারত নির্মাণ করেছিল এখনো হাজার হাজার একর এলাকা জুড়ে সেগুলো অবস্থান করছে। সূরা আল ফজরে যেভাবে আদকে 'যাতুল ইমাদ' (ذات العماد) বলে অর্থাৎ স্তম্ভের অধিকারী পদবী দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি সামুদ জাতির বর্ণনা একথার মাধ্যমে করা হয়েছে, "এমন সব লোক যার উপত্যাকায় পাহাড় কেটেছে।" এ ছাড়া কুরআনে একথাও বলা হয়েচে যে, তারা নিজেদের দেশের সমতল ভূমিতে বড় বড় প্রাসাদ নির্মান করতো। এসব গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল। فَرِهِيْنَ শব্দের মাধ্যমে কোরআন-এর ওপর আলোকপাত করে। অর্থাৎ এসব কিছু ছিল তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব, সম্পদ, শক্তি ও প্রযুক্তির নৈপুন্যের প্রদর্শনী। কোন যথার্থ প্রয়োজনের তাগিদ এর পেছনে কার্যকর ছিল না। একটি বিকৃত ও ভ্রষ্ট সভ্যতার ধরণ এমনিই হয়ে থাকে। একদিকে সমাজের গরীব লোকেরা মাথা গোঁজারও ঠাঁই পায় না আর অন্যদিকে ধনী নেতৃস্থানীয় লোকেরা থাকার জন্য যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাসাদ নির্মাণ করে ফেলে তখন প্রয়োজন ছাড়াই নিছক লোক দেখাবার জন্য স্মৃতিস্তম্ভসমূহ নির্মাণ করতে থাকে। সামুদদের এ গৃহ নির্মাণ শিল্পটি ছিল ভারতের ইলোরা , অজন্তা গূহাও অন্যান্য স্থানে

প্রাপ্ত পর্বত গাত্রের গৃহের ন্যায়। অর্থাৎ তারা পাহাড় কেটে তার মধ্য বিরাট বিরাট ইমারত তৈরী করতো। মাদায়েনে সালেহ এলাকায় এখনো তাদের এসব ইমারত সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। সেগুলো দেখে এ জাতি স্থাপত্য বিদ্যায় কেমন বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছিল, তা অনুমান করা যায়।সামুদ জাতির এ ইমারতগুলোর কিছু সংখ্যক এখনো টিকে আছে। এ ধরণের পাহাড় রয়েছে পূর্বের দিকে আল'উলা থেকে খায়বার যাবার সময় প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে জর্ডানে রাজ্যের সীমানার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত। এর অর্থ দাঁড়ায়, তিন চারশো মাইল দীর্ঘ ও একশো মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট একটি এলাকা ভূমিকম্পে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। করলেন।

এরা শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এদেরকে হেদায়াত দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের ভাই হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম-কে নবী করে দ্বীনের দাওয়াতের জন্য পাঠালেন। সালেহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু নেতৃস্থানীয় ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা কোনোমতেই তাঁর প্রতি ঈমান আনল না। তারা হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম-এর নিকট মুজিযা তলব করল । তারা শলাপরামর্শ করল যে, কিভাবে সালেহ আলাইহিস সালাম-কে জাতির সামনে হেয়প্রতিপন্ন করা যায়। তারা মতৈক্যে পৌছল, এমন আজগুবি প্রস্তাব তারা করবে, যা সালেহ আলাইহিস সালাম-এর দ্বারা কিছুতেই বাস্তবায়ন সম্ভব না হয়।

অবশেষে তারা ভর্ৎসনাচ্ছলে হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম-কে একটি পাথর দেখিয়ে বলল, এটা হতে একটি উষ্ট্রী বের করতে পারলে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা জানানোর পর উক্ত প্রস্তর খণ্ড থেকে আল্লাহর হুকুমে একটি উষ্ট্রী বের হয়ে আসল। হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, এটি আল্লাহ প্রদত্ত উষ্ট্রী; কোনো অবস্থাতেই যেন তারা উক্ত উষ্ট্রীর সাথে দুর্ব্যবহার না করে । কেননা এর সাথে দুর্ব্যবহার করলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ মুজিযা দেখে এক দিনেই চার হাজার লোক ঈমান আনল । কিন্তু পরবর্তীতে কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের প্ররোচনায় তারা আবার মুরতাদ হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল,

কত প্রাণীই জবাই করেছি, তাতে কি আমরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছি? বরং সালেহ আলাইহিস সালাম-এর উষ্ট্রী যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিনই আমাদের মূর্তিপূজা বাধাগ্রস্ত হবে।

তারা সালেহ আলাইহিস সালাম-এর উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে উদ্যত হলো। এক ভাড়াটিয়াকে এ কাজ সমাধা করার জন্য তারা নিযুক্ত করল । সে অত্যন্ত শোচনীয় ও নির্মমভাবে উষ্ট্রীটিকে হত্যা করল । আল্লাহ তায়ালা এ অবাধ্য সামুদ জাতিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আল্লাহর আদেশে হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম তাঁর অনুসারীদেরকে তিনদিনের মধ্যে শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মুমিনগণ মক্কায় এসে বসতি স্থাপন করলেন।

ভূমিকম্পের আযাব তার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে আসার আগে এই বলে সতর্ক করেছেন, ‘আজাবের আলামতও শুনে নাও। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের সবার চেহারা পীতবর্ণের হয়ে যাবে। পুরুষ-মহিলা, শিশু-বৃ্দ্ধ কেউই এর থেকে রেহাই পাবে না।

এরপর শুক্রবার সবার চেহারা পুরোপুরি লাল হয়ে যাবে। পরদিন শনিবার সবার চেহারা একেবারে কালো হয়ে যাবে। আর সেদিনই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন।’ হতভাগা জাতি এ কথা শুনে তাওবা-ইস্তেগফারের পরিবর্তে তাদের নবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।

বৃহস্পতিবার সকালে সালেহ আলাইহিস সালাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সামুদ গোত্রের সবার চেহারা এতটাই হলুদ হয়ে গেল, মনে হচ্ছিল যেন তাদের চেহারায় গভীর হলুদ রং ঢেলে দেয়া হয়েছে। আজাবের প্রথম নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পরও তাদের চোখ খুলল না, তারা আল্লাহর একত্ববাদের ওপর ঈমান আনল না। নিজেদের ভ্রান্ত কাজকর্ম থেকে ফিরেও আসেনি। সালেহ আলাইহিস সালাম-এর ওপর তাদের রাগ ও ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল এবং পুরো সম্প্রদায় তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। মূলত অহঙ্কারী ও অবাধ্যদের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। এর ফলে তারা লাভকে ক্ষতি, ক্ষতিকে লাভ আর ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে। পরদিন

নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার চেহারা লাল হয়ে গেল। তৃতীয় দিন ভীষণ কালো হয়ে গেল। এরপর তারা জীবন থেকে হতাশ হয়ে আজাবের অপেক্ষা করতে লাগল, কখন কীভাবে আসে! এ অবস্থায় জমিনে মারাত্মক এক ভূমিকম্প সৃষ্টি হলো এবং আকাশে ভয়ঙ্কর গর্জনধ্বনি শুরু হলো। তখন সামুদ জাতি আসমানি গজব স্বচক্ষে দেখে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়ে। তখন তাদের করার মতো কিছুই ছিল না। গোত্রের সবাই বসা অবস্থায়ই উপুড় হয়ে করুণ মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। মানব অস্তিত্বের কোনো নিদর্শনই অবশিষ্ট থাকল না।

কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এই শিক্ষণীয় আজাবের বিবরণ এসেছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল। ফলে সকালবেলা তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।' (সুরা আরফ : ৭৮)। 'আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাপিষ্ঠদেরকে পাকড়াও করল। ফলে ভোরবেলা তারা তাদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা কোনো দিন সেখানে বসবাস করেনি।' (সুরা আরফ : ৬৭-৬৮)। এই দুটি আয়াত দ্বারা বোঝা যায় তাদের ওপর দুটি আজাব এসেছিল- ভূমিকম্প ও বিকট গর্জনধ্বনি। 'সুতরাং সকালবেলা ভয়ঙ্কর এক গর্জন তাদেরকে আঘাত করল। তখন তাদের শিল্প-নৈপুণ্য (পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ) তাদের কোনো উপকারে এলো না।' (সুরা হিজর : ৮৩)। 'তারা উটনীটিকে হত্যা করল। ফলে তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল। এর পর তাদেরকে পাকড়াও করল আজাব। নিশ্চয় এ ঘটনায় শিক্ষা রয়েছে।' (সুরা শুআরা : ১৫৭-১৫৮)। 'সুতারং দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম। নিশ্চয় আমি তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি। এই তো তাদের বাড়িঘর তাদের অন্যায়ের কারণে জনশূন্য পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছিল এবং পরহেজগার ছিল, আমি তাদেরকে রক্ষা করেছি।' (সুরা নামল : ৫১-৫৩)। 'এরপর তাদের কৃতকর্মের কারণে অবমাননাকর আজাব তথা বিকট গর্জন তাদেরকে পাকড়াও করল। আর যারা ঈমান এনেছিল এবং খোদাভীরু ছিল, তাদেরকে আমি রক্ষা করলাম।' (সুরা হা-মিম সাজদা : ১৭-১৮)।

'তাদের ওপর বজ্রাঘাত হলো এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখেছিল। এরপর তারা দাঁড়াতেও সক্ষম হলো না এবং এর কোনো বদলাও নিতে পারল না।' (সুরা যারিয়াত : ৪৪-৪৫)। 'আমি তাদের প্রতি একটিমাত্র বিকট গর্জন প্রেরণ করেছি। এতেই তারা

হয়ে গেল শুষ্ক শাখাবিশিষ্ট দলিত ভুসির মতো।' (সুরা কমার : ১৩)। 'আদ ও সামুদ মহাপ্রলয় তথা কেয়ামতকে মিথ্যা বলেছি। এরপর জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল ভয়ঙ্কর গর্জন দ্বারা আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা।' (সুরা হাক্কাহ : ৪-৬)। 'তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদেরকে ধ্বংস করে সবাইকে বরাবর করে দিলেন।' (অর্থাৎ নারী-পুরুষ, বাচ্চা-বুড়ো কাউকেই জীবিত ছাড়লেন না)। (সুরা শামস : ১৪)।

পরিশেষের পরিণতি......

আল্লাহ সামুদ জাতিকে অফুরন্ত নেয়ামত দান করেছিলেন। তারা পাহাড় কেটে আলিশান প্রাসাদ নির্মাণ করত। তাদের পানির ঝরনা, ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা ছিল। আজ সেখানকার পুরো উপত্যকায় কোনো বাগান চোখে পড়ে না; কোনো শস্যক্ষেত বা ঝরনাও দেখা যায় না। ঘরবাড়ির কোনো আলামত নেই কোথাও। শুধু পড়ে আছে বিরান মরুভূমি। যার মধ্যে ও আশেপাশে কিছুদূর পরপর পাহাড় কেটে বানানো কিছু ঘর কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যা তাদের নির্মাণশৈলী ও বসবসকারীদের দুর্ভাগ্যের কথা নীরবে জানান দিয়ে যাচ্ছে। এ জনপদের বর্তমান অবস্থা বর্ণনার জন্য কোরআনে কারিমের এই আয়াতটিই যথেষ্ট- 'এই তো তাদের বাড়িঘর তাদের অন্যায়ের কারণে বিরান পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।' (সুরা নামল : ৫২)। এখনও বহু মানুষ তাদের নিদর্শনগুলো দেখতে আসে। কোরআনে বর্ণিত সামুদ জাতির ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষার উপকরণ রয়েছে।

নমরুদ

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর পিতা ছিলেন আজার। ইরাকের ছোট শহর ‘আওরে’ বসবাস করতেন তারা। আজার ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। বিভিন্ন গোত্রের লোকদের জন্য মূর্তি বানাতেন। তিনি নিজে ছিলেন কট্টোরপন্থি মূর্তিপূজক ও মূর্তিদের তত্ত্বাবধায়ক। এদিকে আল্লাহতায়ালা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-কে প্রথম থেকেই সত্যের উপলব্ধি, সত্যপথ ও হেদায়াত দান করেছিলেন। তিনি ছেলেবেলা থেকেই মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকতেন। পিতা ও গোত্রের লোকদের কার্যক্রম অপছন্দ করতেন। তিনি আশ্চর্যই হতেন এই ভেবে যে, তার পিতা নিজ হাতে মূর্তি বানান, চোখ, কান, নাক লাগান; আবার সেগুলোর পূজা করেন। তিনি পিতার এসব কর্মকাণ্ড ঘৃণার পাশাপাশি প্রকৃত উপাসককে খুঁজতেন। রাতের চাঁদ, আকাশের তারা, দিনের সূর্যের মধ্যে প্রভুকে খুঁজতেন। পরক্ষণে ভাবতেন, এর নিয়ন্ত্রণে নিশ্চয়ই কেউ আছেন। এক দিন সত্য পথ ও আলোর দিশা পেয়ে গেলেন। কোরআনে এরশাদ হয়েছে, ‘আমি তো এর আগে (প্রথম থেকেই) ইবরাহিমকে (হেদায়েত ও) সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তার (কার্যকলাপ) সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম’। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫১)

এর মধ্যে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম নবী হলেন। দেখলেন, তার ঘরেই সবচেয়ে বড় অন্ধকার। তার পিতার ঘরই মূর্তিনির্মাণ ও মূর্তিপূজার কেন্দ্রস্থল। পিতাকে প্রথমে একাত্মবাদের প্রতি আহ্বান করলেন। মূর্তিগুলোর দুর্বলতা, পিতার ভ্রান্তচিন্তা ও আল্লাহর বড়ত্বের পরিচয় তুলে ধরলেন। পিতাকে সত্য ও সঠিক পথে ফিরে আসার অনুরোধ করলেন। পিতা তার কথা শুনলেন না। বললেন, ‘তুমি যদি মূর্তিগুলোর নিন্দা করা থেকে বিরত না হও, তাহলে তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলব’। ইবরাহিম তার পিতার সঙ্গে পারলেন না। গোত্রের অন্য লোকদের দাওয়াত দিতে লাগলেন। কেউ তার কথা শুনল না। নানাভাবেই তিনি তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন। কাজ হলো না। (কাসাসুল কোরআন, মুহাম্মদ হিফজুর রহমান, অনুবাদ: আব্দুস সাত্তার আইনী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৫)

তাদের মেলার দিন সুযোগ বুঝে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দেবতাদের মন্দিরে প্রবেশ করে প্রধান মূর্তটি ছাড়া সবগুলো ভেঙে ফেললেন। প্রধানটির কাঁধে কুঠার রেখে দিলেন। এই ঘটনার বর্ণনা কোরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, ‘এরপর সে প্রধান মূর্তিটি ছাড়া চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে, যাতে তারা (মূর্তিপূজকরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) তার দিকে ফিরে আসে।’ (এবং জিজ্ঞেস করে, এটা কী হয়ে গেল?) (সুরা আম্বিয়া: আয়াত: ৫৮)

মেলা থেকে ফিরে লোকেরা এ অবস্থা দেখে হতভম্ব বনে গেল। পরস্পর জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে জানতে চাইল, এ দুঃসাহস কার? একজন বলল, ‘এটা ইবরাহিম নামক যুবকের কাজ হতে পারে।’ তাকে ডেকে পাঠানো হলো। তিনি বললেন, ‘প্রধানটির কাজ। সেই এরকম করেছে। তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো।’ তারা তাদের অসারতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা বুঝতে পারল।

এ খবর দ্রুতই তৎকালীন শাসক নমরুদের কাছে পৌঁছে গেল। নমরুদ নিজেকে খোদা দাবি করত। তার লোকেরা তাকে খোদা মানত। পৃথিবীর চারজন বড় বড় শাসকের অন্যতম একজন নমরুদ। প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করেছিলো সে।
নমরুদ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে ডাকলেন। তার সঙ্গে অনেক কথা হলো। তিনি তাকে একাত্মবাদের দিকে দাওয়াত দিলেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন নমরুদ কে বারবার আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করলেন, তখন বাদশাহ নমরুদ একত্ববাদের আহ্বানকারী হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলো, ‘সে কেমন প্রভু? যার প্রতি তুমি মানুষকে আহ্বান করছ? আমাকে তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য শোনাও।

তখন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, ‘জীবন-মরণের সব শক্তি তারই হাতে। তিনি সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকর্তা ও পালনকর্তা। কারো সাধ্য নেই যে তার এ ক্ষমতার মধ্যে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের এ প্রশ্নের উত্তরেই নির্ধারিত হয়েছিল যে, একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী শুধুই আল্লাহ তাআলা

তারপরও নমরুদ নিজেকে জীবন-মৃত্যুর ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুজন কয়েদিকে ডেকে এনে একজনকে ফাঁসি আর একজনকে ক্ষমা করে মুক্তির নির্দেশ দেয়। আর বলে আমি নিজেও মানুষকে জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই।

সঙ্গে সঙ্গে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, ‘জীবন-মৃত্যুর বিষয়টি থাকুক। মানুষের সাধারণ বুঝের প্রতি খেয়াল করে তিনি বললেন, ‘প্রকৃতির সাধারণ একটি ক্ষেত্রে তোমার শক্তি পরীক্ষা করে দেখাও। নমরুদ নিজেকে সূর্যদেবীর অবতার মনে করত।

সূর্যকে দেবতা মানার এ ভ্রান্ত আকিদার মূলে কুঠারাঘাত করতেই তিনি নমরুদকে বললেন, ‘(আমি যার দিকে মানুষকে আহ্বান করি সে আল্লাহ তাআলা পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত করেন। তুমি যদি সত্যিই নিজেকে রব ও সূর্য দেবীর অবতার হিসেবে দাবি কর তবে, একবারের জন্য হলেও পশ্চিম দিক থেকে সূর্যকে উদিত করে দেখাও।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের এ দাবির ফলে নমরুদ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তার দাবি পূরণে অপারগ হয়ে যায়। তা করে দেখানো দূরের কথা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কথা শুনেই নমরুদ নির্বাক ও হতবম্ভ হয়ে যায়। এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে-

اَلَمۡ تَرَ اِلَی الَّذِیۡ حَآجَّ اِبۡرٰهٖمَ فِیۡ رَبِّهٖۤ اَنۡ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الۡمُلۡکَ ۘ اِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّیَ الَّذِیۡ یُحۡیٖ وَ یُمِیۡتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحۡیٖ وَ اُمِیۡتُ ؕ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ یَاۡتِیۡ بِالشَّمۡسِ مِنَ الۡمَشۡرِقِ فَاۡتِ بِهَا مِنَ الۡمَغۡرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیۡ کَفَرَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا یَهۡدِی الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِیۡنَ ۚ

অর্থ : আপনি কি ওই ব্যক্তিকে দেখেননি, যে ইবরাহীমের সাথে তার রব সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহীম বললেন, ‘আমার রব তিনিই যিনি জীবনদান করেন ও মৃত্যু ঘটান, সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো। তারপর যে কুফরী

করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (সুরা বাকারা, আয়াত, ২৫৮)

নমরুদ রেগে গিয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে আগুনে নিক্ষেপ করলো। আল্লাহ তায়ালা জ্বলন্ত আগুনকে তার খলিলের জন্য শীতল করে দিলেন।

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'তারা বলল, একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম, হে আগুন, তুমি ইবরাহিমের ওপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইবরাহিমের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, অতঃপর আমি তাদেরই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।' (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৬৮-৭০)

মহান আল্লাহ আগুনকে নির্দেশ দেন—'হে অগ্নি, তুমি হজরত ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৬৯)

এত বড় মু'জিজার পরও হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর একত্ববাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে নমরুদ উল্টো আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার ধৃষ্টতা দেখিয়ে বাহিনী প্রস্তুত করলো। এই ঘোষণার পর সে আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। এই সময় হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দূরে আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

দূরে কালো রঙের একটা মেঘ দেখা যাচ্ছিল, যখন সেটা কাছে চলে এলো, লাখ লাখ মশার গুনগুন শব্দে ময়দান মুখরিত হলো। কিন্তু নমরুদ অবজ্ঞার সুরে বলল, এ তো মশা! তুচ্ছ প্রাণী, তা-ও আবার নিরস্ত্র। এ সময়ের মধ্যে নমরুদের প্রত্যেক সৈন্যের মাথার ওপর মশা অবস্থান নিল।

তাদের বুঝে ওঠার আগেই মশাগুলো তাদের নাক দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করল। তারপর দংশন করা শুরু করল। সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে

তীরন্দাজরা ঊর্ধ্বে তীর নিক্ষেপ আর পদাতিক সেনারা নিজেদের চারপাশে অন্ধের মতো তরবারি চালাল, যার ফলে একে অপরকে নিজেদের অজান্তেই আহত বা নিহত করে ফেলল।

মশার সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে নমরুদ পালিয়ে প্রাসাদে চলে এলো। এ সময় একটি দুর্বল লেংড়া মশা তাকে তাড়া করল এবং কিছুক্ষণ মাথার চারপাশে ঘুরে নাক দিয়ে মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ল। এরপর মগজে দংশন করা শুরু করল। নমরুদ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উন্মাদের মতো প্রাসাদে প্রবেশ করল এবং যন্ত্রণায় দিশাহারা হয়ে পায়ের জুতা খুলে নিজের মাথায় আঘাত করতে শুরু করল। অবশেষে মাথায় মৃদু আঘাত করার জন্য একজন সার্বক্ষণিক কর্মচারী নিযুক্ত করল নমরুদ।
দীর্ঘ ৪০ বছর তাকে এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। অবশেষে মাথার আঘাতের ব্যথায় নমরুদের মৃত্যু হয়। (তাফসিরে ইবনে কাসির, পৃষ্ঠা. ৬৮৬)

কওমে লূত

সূরা শুয়ারা:
১৬০) লূতের জাতি রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করলো

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾

১৬১) স্মরন করো যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি ভয় করো না?

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾

১৬২) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল।

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾

১৬৩) কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

১৬৪) এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের।

﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

লূত আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রিয় নবী। কোরআনের ২৭ স্থানে তার নাম এবং ৭০-এর অধিক আয়াতে তার জাতির বিবরণ বিধৃত হয়েছে। তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর ভাতিজা এবং হারানের পুত্র। জন্ম ইরাকের বাবেল এলাকায়। মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে ওরদুন বর্তমান জর্ডানের মৃতসাগর এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন। সেখানের লোকের ন্যাক্কারজনক সব অপরাধে জড়িত ছিল। সমকামিতার মতো রুচি, বিবেক ও সমাজ বিধ্বংসী পাপের কাজেও তারা লিপ্ত ছিল। তাদের আগে কোনো জাতি এ কাজে লিপ্ত হয়নি। আসমানি কঠিন আজাবে তাদের ধ্বংস হয়। নিম্নে তাদের বিস্তারিত বিবরণ।

লূত আলাইহিস সালাম এবং তার জাতির বিবরণ

লূত আলাইহিস সালাম পশ্চিম ইরাকের বসরার নিকটবর্তী বেবিলনের বাসিন্দা ছিলেন। চাচা ইবরাহিম নবুওয়াত প্রাপ্ত হলে তিনি তার ওপর ঈমান আনেন। অতপর তার (ইবরাহিমের) প্রতি ঈমান স্থাপন করলেন লূত (সুরা আনকাবুত : ২৬)। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হিজরতে আদিষ্ট হলে, লূতও তার সঙ্গে সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং জর্ডান নদীর তীরাঞ্চল বাইতুল মুকাদ্দাসের অদূরে কেনানে অবস্থানের জন্য আদিষ্ট হন। লূত আলাইহিস সালাম সেখানেই নবুওয়াত লাভে ধন্য হন এবং জর্ডান ও বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদুম অধিবাসীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আদিষ্ট হন। সেখানে সাদুম, আমুরা, উমা, সাবুবিম ও সুগর নামে পাঁচটি শহর ছিল।

সাদুম সেগুলোর রাজধানী ছিল এবং লূত আলাইহিস সালাম সেখান থেকেই ইসলাম প্রচারের কাজ করেছিলেন (মাআরেফুল কোরআন : ৪৬০)। এরাই কওমে লূত নামে পরিচিত।

সমকামিতায় আসক্ত লূত আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়

এই সম্প্রদায়ের সর্বাধিক ঘৃণিত বিষয় ছিল সমকামিতা। ধনৈশ্বর্যে মত্ত হয়ে কাম-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার শিকার হয়ে এরা লজ্জা শরম, ভালো খারাপের জ্ঞান পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিল। তারা এমন কাজে নিজেদের জরিয়ে ফেলে জন্তু-জানোয়ারও সাধারণত যে কাজে জড়ায় না। আল্লাহ লূত (আ.) কে তাদের হেদায়াতের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি তাদের বললেন এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে কেউ করেনি? তোমরা তো কামবশত পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদের ছেড়ে। বরং তোমরা সীমাতিক্রম করেছ (সুরা আরাফ : ৮০-৮১)। খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক বলেন, যদি কোরআনে আল্লাহ সাদুম সম্প্রদায়ের সমকামিতার কথা বর্ণনা না করতেন তাহলে আমি বিশ্বাসেই করতাম না যে, একজন পুরুষ অপর পুরুষের সঙ্গে কাম-চরিতার্থ করে (ইবনে কাসির ৩ : ৪৪৫)। সমকামিতার মতো মন্দ কাজের জন্মদাতা এরাই।

সমকামিতা ব্যভিচার থেকেও জঘন্যতর

পুরুষে পুরুষে কিংবা নারীতে নারীতে কামরিপু চরিতার্থ করা যেনা হতেও গুরুতর জঘন্য অপরাধ। কারণ, যেনা ব্যাভিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালা ‘ফাহিশা’ শব্দকে আলিফ-লামহীন ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সমকামিতার ক্ষেত্রে ‘আল-ফাহিশা’ আলিফ-লামসহ ব্যবহার করেছেন। যা ঈঙ্গিত বহন করে যে, স্বভাব বিরুদ্ধ এই সমকামিতা একাই সব অশ্লীলতার সমাহার এবং যেনা ব্যভিচারের থেকেও কঠোর অপরাধ (মাআরেফুল কোরআন ৪ : ৪৬১) । তাই, ভদ্র কোনো জাতি এমন অশ্লীলতার অনুমোদন

করতে পারে না। যারা এমনটা করবে, তারা আসমানি আজাবকে নিজেদের ওপর অত্যাবশ্যক করে নেবে।

জাতিকে সমকামিতা পরিহারে লূতের প্রাণান্তকর চেষ্টা

লূত আলাইহিস সালাম তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছালেন। আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখালেন। কোরআনের ভাষায়, লূতের সম্প্রদায় পয়গম্বরদের মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই লূত তাদের বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসুল। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা দেবেন। সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই পুরুষদের সঙ্গে কুকর্ম কর (সুরা শুয়ারা : ৬০-৬৬) । লূত আলাইহিস সালাম এর এমন আহ্বান তাদের মনের বদ্ধ দুয়ার উন্মোচিত হয়নি। তারা সমকামিতা থেকে বিরত থাকেনি। উল্টো লূত আলাইহিস সালাম-কে এলাকার থেকে তাড়ানোর জন্য সকলে ঐকমত্যে পৌঁছে। সুরা আরাফে এসেছে, জবাবে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, এদের (লূত তার পরিবার ও অনুসারীদের) তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কৃত কর, এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায় (৮২)।

এই সম্প্রদায় লূত আলাইহিস সালাম-কে দেশান্তরিত করার হুকমি দিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি বরং তারা এমন কথাও বলে যার দ্বারা স্বয়ং আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তারা নিজেদের ভুল ও অপবিত্রার ওপর অটল থাকে এবং লূত আলাইহিস সালাম এর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে যে, আমরা সমকামিতার ওপর অটল থাকব। আপনি সত্যবাদী হলে, যে আজাবের প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছেন তা নিয়ে আসুন। যেমনটা কোরআনে এসেছে, আর প্রেরণ করেছি লূতকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে পৃথিবীর কেউ করেনি। তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কাজ করছ? জবাবে তার সম্প্রদায় শুধু একথা বলল, আমাদের ওপর আল্লাহর আজাব আন যদি তুমি সত্যবাদী

হও (সুরা আনকাবুত ২৮ : ২৯)। বর্তমান পৃথিবীতেও এটাই হচ্ছে, সমকামিতার মত ধ্বংসাত্মক কাজকে ঘৃণার বিপরীত রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব হারাচ্ছে এবং নিজেদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছে।

সাদুম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লূতের দোয়া

পাপিষ্ঠ ও দুরাচারীরা ছাড় পেয়ে ঔদ্ধত্য হয়। আসমানি কোনো গজব আসছে না দেখে মনে করে সেই পরাক্রমশালী, তাকে ধ্বংস করার কেউ নেই। লূত (আ.) তাদের এমন অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্বীয় দোয়ায় বললেন, সে বলল, হে আমার পালনকর্তা দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর (সুরা আনকাবুত : ৩০)। আল্লাহতায়ালা নবী লূতের দোয়া কবুল করেন। সাদুম সম্প্রদায়ের ওপর আসমানি আজাব আসা নিশ্চিত হয় এবং তাদের ধ্বংসের দিন-ক্ষণ গণনা শুরু হয়ে যায়।

লূত আলাইহিস সালাম এর সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ফেরেস্তাদের আগমন

কওমে লূতের পাপ, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও অপকর্মে, আল্লাহ এবং নবীকে অমান্যকরণে সীমালংঘন করেছিল। সেহেতু আল্লাহতায়ালা তাদের ধ্বংসে ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন। ফেরেশতারা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং লূত আলাইহিস সালাম এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের খবর দেন। সেখান থেকে তারা সুন্দর যুবকের আকৃতিতে লূত আলাইহিস সালম-এর বাড়িতে মেহমান হিসাবে আগমন করেন। কোরআনের ভাষায়, এরপর ফেরেস্তারা যখন লূত-পরিবারের কাছে এলো, তখন লূত বলল, তোমরা তো অপরিচিত লোক (সুরা হিজর : ৬১-৬২)। তাদের দেখে লূত (আ.) চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে যান। কারণ, সাদুম সম্প্রদায়ের লোক এতটাই নিকৃষ্ট মনের অধিকারী ছিল যে, অপরিচিত কোন যুবকও তাদের কাম-চরিতার্থহীন কর্ম থেকে মুক্তি পেত না।

যুবকরূপী ফেরেশতাদের সঙ্গে সমকামে উদ্ধৃত

ফেরেশতারা লূত আলাইহিস সালাম-এর বাসায় পরিপাটি যুবক আকৃতিতে এসেছিলেন। লূত আলাইহিস সালাম নবাগত যুবক মেহমানদের সম্ভ্রম রক্ষার চিন্তায় পেরেশান ছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন খবর পাওয়া মাত্রই পাপাচারী লোকেরা ছুটে আসবে তাদের সঙ্গে সমকামে লিপ্ত হতে। নিজের মেহমানদের সম্মান রক্ষা করতে না পারা একজন নবীর জন্য মন-কষ্টের। লূত আলাইহিস সালাম ধারণা সঠিক হয়, তারা খবর পেয়ে বাসার চারিদিকে একত্রিত হয়। মেহমানদের বের করে দিতে জোর দাবি জানায়। সুরা হিজরে এসেছে-নগরবাসীরা উল্লাসিত হয়ে উপস্থিত হলো। লূত বলল, তারা আমার অতিথি, সুতরাং তোমরা আমাকে বেইজ্জত করো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে হেয় করো না ৬৭-৬৯) । লূতের এসব কথার উত্তরে তারা বলে, আমরা কি আপনাকে দুনিয়াসুদ্ধ মানুষকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করিনি (৭০)।

ফেরেশতাদের অভয়বাণী এবং এলাকা পরিত্যাগের আদেশ

সমকামিতায় মত্ত পাগল জাতি আল্লাহ এবং তার আজাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেমালুম, বেখবর। নবীর কথায় কর্ণপাতহীন অপরিচিত মেহমানদেরও কামরিপু চরিতার্থ থেকে নিস্তার দিতে নাখোশ।

আল্লাহ যথেষ্ট বলেছেন,
তাদের অন্তর আছে বটে, তবে তা দ্বারা বুঝে না, চোখ আছে তা দিয়ে দেখে না, কানও আছে; কিন্তু তা দিয়ে শুনে না এরা পশুর মতো বরং তার থেকেও নিকৃষ্ট (সুরা আরাফ : ১৭৯)।
প্রকৃতপক্ষেই এরা কুকুরের থেকেও অধম। ফেরেশতারারা লূত (আ.)-এর পেরেশানি বুঝতে পেরে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করলেন এবং সাদুম সম্প্রদায়ের ধ্বংসের খবর দিয়ে তাকে শান্ত হতে বললেন। কোরআনের ভাষায়-তারা(ফেরেশতারারা) বলল,

"হে লূত নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেস্তা। তারা কখনোই তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাতের কোনো এক সময় পরিবারসহ বের হয়ে পড় এবং তোমাদের কেউ পেছনে তাকাবে না" (সুরা হুদ : ৮১)।

ভয়ঙ্কর আযাবের সম্মুখীন কওমে লূত

লূত আলাইহিস সালাম হাজারো তদবির, প্রচেষ্টা, ভয়ভীতি এবং বোঝানোর মাধ্যমে তাদের সমকামিতা বিমুখ করতে পারেনি। আল্লাহর অঙ্গীকার নিশ্চয়ই ভোর তাদের (শাস্তির) নির্ধারিত সময়।
ভোর কি নিকটবর্তী নয়? (সুরা হিজর: ৫৮)।
সুবহে সাদিকের সময় এই অভিশপ্ত জাতির ওপর আল্লাহর আজাব নেমে আসে। যাতে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। পৃথিবীতে যতগুলো জাতি আসমানি আজাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে সর্বাধিক ভয়ঙ্কর ছিল সাদুম সম্প্রদায়ের আজাব। যা শ্রবণে গায়ের পশম শিহরিত হয়, অন্তরাত্মা কম্পমান হয়। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

প্রচণ্ড শব্দের মাধ্যমে আযাবের সূচনা :

আল্লাহর আজাবের আগাম বার্তা হিসাবে সূর্যোদয়ের সময় এক প্রচণ্ড শব্দ তৈরি করেন। যে বিকট শব্দ তারা এর আগে কখনো শোনেনি। কোরআনে এসেছে, অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তাদের প্রচণ্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল (সুরা হুজর : ৭৩)।

সম্পূর্ণ জনপদকে উল্টিয়ে দেয়া :

যদিও তাদের আজাবের ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তারিত বিবরণ কোরআনে আসেনি। কিন্তু যা আছে তা থেকে অনুমেয় যে, শাস্তি হিসাবে প্রথমে তাদের জনপদকে উল্টিয়ে দেয়া হয়। যেমনটা কোরআনে এসেছে-
অবশেষে যখন আমার হুকুম (আজাব) এসে পৌঁছল, তখন আমি ওই জনপদকে উল্টিয়ে ওপর-নীচ করে দিলাম (সুরা হুদ : ৮২)।

বর্ণিত আছে, আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্র জিবরাঈল (আ.) তার পাখা জনপদের তলদেশে এমনভাবে প্রবেশ করে মহাশূন্য-আসমান পর্যন্ত এমনভাবে উত্তোলন করেন যে, সবকিছু আপন স্থানে স্থির ছিল। এমন কি পানি ভর্তি পাত্র থেকে এক-বিন্দু পানিও পরেনি। এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে মানুষ, পশু-পাখির বিকট চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হচ্ছিল। জনপদটিকে মহাশূন্য থেকে উল্টিয়ে আবার যথাস্থানে সজোরে নিক্ষেপ করা হয় (মাআরেফুল কোরআন : ৬৪০)।
বলা হয় যে, এর কারণে সেই জনপদটি ৪০০ মিটার নিচে চলে যায়। তারা আল্লাহর বিধানকে উল্টিয়েছিল, আল্লাহও তাদেরকে উল্টে দিয়েছেন।

পোড়ামাটির কঙ্কর বর্ষণ :

ভাবতে পারেন! মহাশূন্য থেকে মাটি চাপা দেয়ায় তাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল? কিন্তু এরপরেও আল্লাহর আজাব শেষ হয়নি। এবার তাদের ওপর পোড়ামাটির কঙ্কর বর্ষণ করা হয়। যে পাথরগুলোতে বিশেষ ব্যক্তির নাম চিহ্নিত ছিল। যার কারণে পাথরগুলো নিদৃষ্ট ব্যক্তির ওপরেই পতিত হয়েছে। যেমনটা কোরআনে এসেছে-
" এবং আমি তাদের ওপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর কঙ্কর, যা তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত ছিল।" (সুরা হুদ : ৮২-৮৩)।

আল্লাহ কোরআনে এই ঘটনা এমনি এমনি বর্ণনা করেননি। বরং এর পিছনে বিশেষ অ্যাজেন্ডা আছে। তিনি জানতেন, শেষ জমানায় এমন কিছু মানুষ নামের অমানুষ আসবে যারা কওমে লূত জাতির ঘৃণিত এই কাজে লিপ্ত হবে। সমকামিতা এক ধরনের নেশা। মদ, অ্যালকোহল এবং অন্যান্য নেশাদ্রব্য যেমন মানুষের সুন্দর জীবনকে বিনাশ করে, তেমনি সমকামিতাও মারাত্মক এক নেশার নাম। যেমন আল্লাহ বলেছেন- আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় (সমকামিতায়) মত্ত ছিল (সুরা হুজর : ৭২)।

এ নেশা জীবন যৌবন, দুনিয়া আখেরাত সবই ধ্বংস করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই তা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

ফির'আউন

পৃথিবীতে অত্যাচারী ও খোদাদ্রোহী শাসকদের একজন ছিল ফির'আউন। অত্যাচারের দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ টানতে গেলেই মানুষের মুখে চলে আসে

ফির'আউনের নাম। ফির'আইন শুধু অত্যাচারী শাসকই ছিল না, সে নিজেকে খোদা দাবি করতো, আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে তার ইবাদত ও পূজা করতে বলতো।

ফির'আউনের সীমালঙ্ঘন

এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, (হে মুসা!) ফির'আউনের নিকট যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে।এবং (তাকে) বল, 'তোমার কি আত্মশুদ্ধির কোন আগ্রহ আছে? আর আমি কি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাব, ফলে তুমি তাঁকে ভয় করবে?

অতঃপর সে তাকে মহা নিদর্শন দেখাল।কিন্তু সে মিথ্যাজ্ঞান করল এবং অবাধ্য হল। অতঃপর সে পিছন ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল। সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চ স্বরে ঘোষণা করল। আর বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।' (সুরা নাজিয়াত, আয়াত, ১৭-২৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যদি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো, আমি তোমাকে কয়েদিদের অন্তর্ভুক্ত করব।' (সুরা শুআরা, আয়াত : ২৯)

ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ফির'আউনের নির্মম নির্যাতন ও শিশুহত্যা

ফির'আউন তার রাষ্ট্র ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে মানুষের ওপর নির্মম নির্যাতন চালাতো এবং সে যুগের শিশুদের হত্যা করতো। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'ফির'আউন তার দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে

তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করত এবং নারীদের জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী।'(সুরা কাসাস, আয়াত, ৪)

পবিত্র কোরআনের ২৭ টি সুরায় সর্বমোট ৭৪ বার ফির'আউনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং খোদাদ্রোহী এই অত্যাচারির করুণ পরিণতির কথা তুলে ধরা হয়েছে।

ইতিহাসে ফির'আউন ইতিহাসের বর্ণনামতে, 'ফির'আউন' কোনো ব্যক্তির নাম নয়। এটি তৎকালীন মিসরের সম্রাটদের উপাধি। কিবতি বংশীয় এই সম্রাটরা কয়েক শতাব্দীব্যাপী মিসর শাসন করেছেন। এ সময় মিসর সভ্যতা-সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। লাশ মমি করা, পিরামিড তৈরি প্রভৃতি তাদের সময়কার বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রমাণ বহন করে।

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম -এর সময় পরপর দুজন ফির'আউন ছিল। লুইস গোল্ডিংয়ের তথ্য অনুযায়ী জালিম ফির'আউনের নাম ছিল দ্বিতীয় রামাসিস। আর ডুবে মরা ফির'আউন ছিল তার পুত্র মানেপতাহ বা মারনেপতাহ।

ফির'আউনের উজির হামান

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর যুগে মিশরের বাদশাহ ফির'আউন ভীষণ অত্যাচারী ছিল। তার উজির হিসেবে নিযুক্ত ছিল হামান নামক এক ব্যক্তি। এই হামান ফির'আউনকে দুনিয়ার বাদশাহ হবার স্বপ্ন দেখাতে লাগলো। প্রজারা যাতে নীরেট মূর্খ হয়ে থাকে এবং তাকে খোদা বলে মান্য করে তার জন্য নানা যুক্তি-পরামর্শ দিতে লাগলো।

শিক্ষাকার্যক্রম বন্ধ :

হামানের পরামর্শ মতো ফির'আউন পাঠশালা ও মক্তব রাজ্য থেকে উঠিয়ে দেশময় প্রচার করে দিলেন যে, কেউ আর লেখা-পড়া শিখতে পারবে না। রাজার আদেশ অমান্য করলে সবংশে তার গর্দান যাবে।

প্রজারা ফেরাউনের আদেশ মতো চলতে লাগলো। সারাদেশে কিছুকালের মধ্যে একেবারে গণ্ডমুর্খতে পূর্ণ হয়ে গেল। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর তিনি প্রত্যেককে একটা করে নিজের প্রতিমূর্তি দিয়ে তাকে সৃষ্টিকর্তা এবং উপাস্য বলে পূজা করতে হুকুম দিল। এবং প্রজারা তার আদেশমতো ফির'আউনের প্রতিমূর্তিকেই খোদা বলে মানতে শুরু করল।

খোদাদ্রোহী ফির'আউনের মুখোমুখি মুসা আলাইহিস সালাম

. এসময় আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালাম-এর ওপর ওহী নাজিল করলেন এবং পথভ্রষ্ঠ মানুষকে সত্য ধর্মে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্তির পর একদিন মুসা তার বড় ভাই হারুন আলাইহিস সালাম-কে সঙ্গে নিয়ে ফির'আউনের দরবারে এসে হাজির হলেন।

ফির'আউনকে উদ্দেশ্য করে মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'তুমি যে নিজেকে খোদা বলে প্রচার করছেন, তা অত্যন্ত অন্যায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মানবের উপাস্য নেই। আমি আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর'।

ফির'আউন তাকে তাচ্ছিল্য করে তার ওপর এবং তার ধর্মে বিশ্বাসীদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালাতে লাগলো। তার নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার পর আল্লাহর হুকুমে মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মিশর ছেড়ে যাওয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'আমি মুসাকে প্রেরণ করি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট সনদসহ। (পাঠিয়েছিলাম) ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। তবু তারা (ফির'আউনের জাতি) ফির'আউনের নির্দেশমতো চলতে থাকে। অথচ ফির'আউনের

কোনো কথা ন্যায়সংগত ছিল না (তার কার্যকলাপ ভালো ছিল না)।-(সুরা : হুদ, আয়াত : ৯৬-৯৭)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, ‘ফির’আউন বলল, কী! আমি অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় এটা কোনো চক্রান্ত। তোমরা এই শহরে পারস্পরিক যোগসাজশে এই চক্রান্ত করেছ, যাতে তোমরা এর বাসিন্দাদের এখান থেকে বহিষ্কার করতে পার। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই এর পরিণাম জানতে পারবে। আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব তারপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।’ (আরাফ ৭ : ১২৩-১২৪)।

তাদের চলে যেতে দেখে কুটিল হামানসহ আরও উজিররা ফির’আউনকে কুপরামর্শ দিতে লাগলো। তাদের কুপরামর্শে ফির’আউন সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করল।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘ফির’আউন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ (ফিরাউনকে) বলল, আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে মুক্ত ছেড়ে দেবেন, যাতে তারা (অবাধে) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদের বর্জন করতে পারে? সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব, আর তাদের ওপর আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছে।’ (আরাফ ৭ : ১২৭)।

মুসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর অনুসারীরা ততক্ষণে লোহিত সাগরের তীরে এসে পৌঁছে গেছেন। এমন সময় তারা পেছন তাকিয়ে দেখতে পেলেন, ফির’আউনের অগণিত সৈন্য তাদের ধরার জন্য এগিয়ে আসছে। তাদের পেছনে এই বিপদ, সামনে প্রকাণ্ড লোহিত সাগর।

তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। এমন সময় মহান আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালাম-কে আদেশ করলেন, মুসা, ‘তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রের ওপর আঘাত করো’। মুসা আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর নির্দেশমতো তাই করলেন।

বিশাল সাগর দুই ভাগে ভাগ হয়ে দেয়ালের মতো দুইপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। সেই পথ দিয়ে মুসা আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীরা নিরাপদে ওপারে চলে গেলেন।

ফির'আউনের করুণ মৃত্যু

তখনও সাগরের সেই রাস্তা সেভাবেই রয়ে গেলো। ফির'আউন তার লোকজন এবং সৈন্যসামন্তসহ ওপারে এসে থামল। সে দেখলো, সাগরের মাঝে একটি আশ্চর্য রাস্তা তৈরি হয়েছে। সে মুসা আলাইহিস সালাম ও তার লোকজনদের ওপারে পার হতে দেখল।

সে মুসা আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের আক্রমণ করতে তার বাহিনী নিয়ে লোহিত সাগরের সেই রাস্তায় নেমে পড়ল। যখন ফেরাউনের বাহিনী সাগরের মাঝামাঝি এসে পৌঁছাল এমন সময় মহান আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম-কে বললেন, 'তাড়াতাড়ি সাগরের ওপরে তোমার লাঠি দিয়ে আবার আঘাত করো'। মহান আল্লাহর হুকুমমতো মুসা আলাইহিস সালাম সাগরের পানিতে আঘাত করলেন, অমনি দুই দিক থেকে পানির খাড়া উঁচু স্রোত ফেরাউন ও তার সৈন্যদের ওপর পড়ে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। ধ্বংস হয়ে গেল ফির'আউন ও তার বাহিনী।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ফির'আউন ও তার বাহিনী জমিনে অন্যায় অহমিকা প্রদর্শন করেছিল। তারা মনে করেছিল তাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না। সুতরাং আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সাগরে নিক্ষেপ করলাম। এবার দেখ, জালিমদের পরিণতি কী হয়ে থাকে! (সূরা : কাসাস ২৮ : ৩৯-৪০)।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, 'আমি বনী ইসরাইলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। তখন ফিরাউন ও তার বাহিনী যুলুম ও সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে ডুবে মরার সম্মুখীন হলো, তখন বলতে লাগল, আমি স্বীকার করলাম, বনী ইসরাইল যেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া কোনোও ইলাহ নেই এবং

আমিও অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। (উত্তর দেয়া হলো) এখন ঈমান আনছ? অথচ এর আগে তো তুমি অবাধ্যতা করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। সুতরাং আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তী কালের মানুষের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। (কেননা) আমার নিদর্শন সম্পর্কে বহু লোক গাফেল হয়ে আছে।' (ইউনুস ১০ : ৯০-৯২)

আমাদের জন্য শিক্ষা

ফির'আউনের মৃত্যুর বহু বছর পর ১৯০৭ সালে তার লাশ আবিষ্কৃত হয়। সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে 'জাবালে ফির'আউন' নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। এখানেই ফির'আউনের লাশ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় বলে জনশ্রুতি আছে। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকার নিবন্ধে বলা হয়েছে, থেবস নামক স্থানের সমাধি মন্দিরে ১৮৯৬ সালে একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়। তার লাশ মমি করে মিশরের রাজধানী কায়রোতে নীলনদের অদূরে রয়্যাল মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।
যুগে যুগে আল্লাহর নাফরমানদের এমন করুণ পরিণতিই হয়েছে।।

অভিশপ্ত জাতি বনি ইসরাঈল

আসমানি ধর্মগুলোর মধ্যে ইহুদি ধর্ম সবচেয়ে পুরনো। সাধারণত ইহুদি বলতে আল্লাহর নবী মূসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারীদের বোঝানো হয়। বনি ইসরাইল নামে পরিচিত এই সম্প্রদায় সে সময় আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হলেও পরবর্তী সময়ে নিজেদের ধর্মগ্রন্থের বিকৃতি করে। পবিত্র কোরআনে ইহুদি জাতি প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা এসেছে। তাদের গুণাবলি, জীবনাচারসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ রয়েছে তাতে।

বনি ইসরাইলের পরিচয়

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে জিন ও মানুষের হিদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইবরাহিম (আ.)-কে ইরাকের বাবেল শহরে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সারাহকে নিয়ে ফিলিস্তিনের আল-খলিল নগরীতে চলে যান। সেখানে তাঁর সন্তান ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর জন্ম হয়। ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর সন্তান ছিলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর আরেক নাম ছিল ইসরায়েল। আর তাঁর সন্তানদের বলা হতো বনু ইসরাইল।

পবিত্র কোরআনে ইহুদিদের বিভিন্ন দোষ ও গুণের কথা এসেছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো—

১. *শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা* : মহান আল্লাহ ইহুদি জাতিকে তাদের সময়ে শ্রেষ্ঠ জাতি করেছিলেন, তবে তাদের অপরাধপ্রবণতা, ঔদ্ধত্য আচরণ ও অহমিকার কারণে তারা বিরাগভাজন হয় এবং পৃথিবীর সবচেয়ে নিপীড়িত জাতিতে পরিণত হয়। ইরশাদ হয়েছে, ‘হে বনি ইসরাইল, আমার অনুগ্রহগুলো স্মরণ কোরো, যা আমি তোমাদের দিয়েছিলাম এবং আমি তোমাদের সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ৪৭)

২. *মুমিনদের প্রতি সব সময় বিদ্বেষী* : বনি ইসরাইল মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। পবিত্র কোরআনে মহানবী হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ‘আপনি মানুষের মধ্যে ইহুদি ও মুশরিকদের সবচেয়ে বেশি শত্রুভাবাপন্ন পাবেন, এবং যারা বলে, আমরা খ্রিস্টান, আপনি তাদের মুমিনদের নিকটতর বন্ধুত্বে দেখবেন...।
(সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৮২)

৩. *কপটতা ও অর্থলোভ* : কোরআনে বনি ইসরাইলকে ধুরন্ধর ও অর্থলোভী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘আসলে তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশি, কারণ তারা অবুঝ সম্প্রদায়।’ (সুরা : হাশর, আয়াত : ১৩)

৪. *বিশ্বাসঘাতকতা* : সব সময় বিশ্বাস ভঙ্গ করা বনি ইসরাইলের একটি মন্দ স্বভাব। তাই তাদের সঙ্গে চুক্তি করার ক্ষেত্রে সতর্ক করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘তারা যখনই অঙ্গীকার করেছে, তখনই তা ভঙ্গ করেছে, বরং তাদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী।’
(সুরা : বাকারা, আয়াত : ১০০)

৫. *পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা* : বনি ইসরাইল সুযোগ পেলেই বিশৃঙ্খলা বা সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘তারা যতবার যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে মহান আল্লাহ ততবার তা নিভিয়েছেন, তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করে বেড়ায়, আল্লাহ বিশৃঙ্খল ব্যক্তিদের ভালোবাসেন না।’ (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৬৪)

৬. *দীর্ঘায়ু লাভের আকাঙ্ক্ষা* : ইহুদিদের মধ্যে বেঁচে থাকার বাসনা প্রবল। ইরশাদ হয়েছে, ‘আপনি জীবনের প্রতি তাদেরকে সব মানুষের মধ্যে, এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশি লোভী পাবেন, তাদের সবাই আকাঙ্ক্ষা করে যদি তাদের হাজার বছর আয়ু দেওয়া হতো, কিন্তু দীর্ঘায়ু তাদের শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না, তারা যা করে আল্লাহ তার দ্রষ্টা।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ৯৬)

৭. *আল্লাহকে দোষারোপ* : পৃথিবীতে একমাত্র বনি ইসরাইল আল্লাহকে নানাভাবে গালমন্দ করেছে। কখনো তারা আল্লাহকে দরিদ্র বলে আখ্যায়িত করেছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত, তাদের কথা ও অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করার বিষয়টি আমি লিখে রাখছি, আমি বলব, জ্বলন্ত আজাব ভোগ কোরো। (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৮১)

৮.*নিজেদের আল্লাহর সন্তান দাবি* : ইহুদিরা নিজেদের আল্লাহর সন্তান বলে দাবি করে। ইরশাদ হয়েছে, ‘ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন, আপনি বলুন, তাহলে তিনি তোমাদের অপরাধের কারণে কেন শাস্তি দেবেন, বরং তোমরা মানুষ...।’
(সুরা : মায়িদা, আয়াত : ১৮)

৯.*মানুষকে তাচ্ছিল্য করা* : ইহুদিরা নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে এবং অন্যদের নিচু মনে করে। ইরশাদ হয়েছে, 'কিতাবধারীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যার কাছে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দেবে, আবার এমন লোকও আছে, যার কাছে এক দিনার রাখলেও তার পেছনে লেগে না থাকলে সে তা ফেরত দেবে না; এর কারণ তারা বলে, নিরক্ষরদের ওপর আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং তারা জেনেশুনে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে।'
(সুরা : আলে-ইমরান, আয়াত : ৭৫)

১০. *নবীদের হত্যা* : বনি ইসরাইল অসংখ্য নবী-রাসুলকে হত্যা করেছে। ইরশাদ হয়েছে,
'যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে এবং যারা ওই সব মানুষকে হত্যা করে, যারা ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেয়, আপনি তাদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দিন।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ২১)

অবশেষে আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণাম

আল্লাহর অভিশাপ : বনি ইসরাইলের অপকর্মের কারণে মহান আল্লাহ তাদের ওপর ক্ষুব্ধ হন এবং তাদের চিরস্থায়ীভাবে লাঞ্ছিত করেন। ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ ও মানুষের প্রতিশ্রুতি ছাড়া তারা যেখানেই ছিল লাঞ্ছিত হয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তারা অভাবগ্রস্ত হয়েছে, কারণ তারা আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করত এবং অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করত, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘন করত।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১১২)

বারবার শাস্তি : বনি ইসরাইলের লোকেরা যুগে যুগে আল্লাহর শাস্তির মুখোমুখি হয়েছে। তারা জালিম শাসকের নিয়ন্ত্রণে থেকে লাঞ্ছনাকর জীবন যাপন করেছে। ইরশাদ হয়েছে, 'স্মরণ করুন ওই সময়ে কথা, যখন আপনার রব ঘোষণা করেন যে তিনি কিয়ামত

পর্যন্ত তাদের ওপর এমন লোক পাঠাবেন, যারা তাদের কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে, আপনার রব শাস্তি দিতে তৎপর এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

(সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৬৭)

আবরাহা ও হস্তিবাহিনী

মহানবী (সা.)-এর জন্মের বছর ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকা সাম্রাজ্যের নাজ্জাশি বাদশাহর অধীনে ইয়েমেনের গভর্নর ছিলেন আবরাহা বিন সবাহ। তিনি চিন্তা করলেন যে আরবদের মক্কায় হজ বাদ দিয়ে ইয়েমেনে হজ করাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাবার আদলে একটি ঘর নির্মাণ করেন। এর নাম ছিল ‘কুল্লাইস’।

সর্বত্র ঘোষণা করা হলো যে এ বছর থেকে হজ কাবাগৃহের বদলে এখানে হবে। তাঁর এই ঘোষণা সর্বত্র দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। কুরাইশরা রাগে ফেটে পড়ল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, কুরাইশদের একদল যুবক ওই গির্জায় ঢুকে আগুন ধরিয়ে দেয়, যাতে গির্জা পুড়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এর প্রতিশোধে কাবা শরিফ ধ্বংস করার জন্য আবরাহা বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। কোনো বর্ণনায় ২০ হাজার এবং কোনো বর্ণনায় ৬০ হাজার সেনার কথা এসেছে। ওই বাহিনীর সঙ্গে নাজ্জাশির পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশালবপু হস্তিবাহিনী পাঠানো হয়, যার নেতৃত্বে ছিল মাহমুদ নামের একটি হাতি।হস্তিবাহিনীর সংখ্যা কেউ বলেছে একটি, কেউ বলেছে দুটি, আটটি বা ১২টি বা তারও বেশি। তবে মাহমুদ ছিল এদের নেতা। বাকিরা মাহমুদের অনুগামী। এদের নেওয়া হয়েছিল এ জন্য যে লোহার শিকলের এক প্রান্ত কাবার দেয়ালে বেঁধে অন্য প্রান্ত হাতির ঘাড়ে বাঁধা হবে। এরপর হাতিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে, যাতে পুরো কাবাগৃহ একসঙ্গে উপড়ে পড়ে।

অতঃপর আবরাহা যখন মক্কা অভিমুখে রওনা হওয়ার উদ্যোগ নেন, হাতিকে মক্কার দিকে হাঁকাতে চেষ্টা করেন, তখন হাতি বসে পড়ে। তারপর শতচেষ্টা করেও হাতিকে মক্কামুখী করা যায়নি। অথচ ইয়েমেনমুখী করা হলেই হাতি দৌড় দেয়, মক্কামুখী করলেই

বসে পড়ে। এরই মধ্যে সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে অচেনা পাখি আসতে শুরু করে, যাদের সবার মুখে একটি এবং দুই পায়ে দুটি কঙ্কর ছিল, যা ডাল ও গমের মতো। এই কঙ্কর যার মাথায় পড়েছে, সে-ই ধ্বংস হয়েছে। কিছু আঘাতপ্রাপ্তকে মরতে দেখে বাকি সবাই দিগ্বিদিক ছুটে পালাতে শুরু করে। ইবনু ইসহাক বলেন, আবরাহার বাহিনী মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত মরতে মরতে যায়। আবরাহা তাঁর প্রিয় রাজধানী ছানআ শহরে পৌঁছে লোকদের কাছে আল্লাহর আজাবের ঘটনা বলার পর মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তাঁর বুক ফেটে কলিজা বেরিয়ে যায়। (ইবনে কাসির ও তাফসিরে মুনির)

আবরাহার এই হামলার সময় মক্কার অধিবাসীরা প্রাণভয়ে পাহাড়ে-প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ল এবং পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করল। সেনাদলের ওপর আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হলে তারা নিশ্চিন্তে নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে যায়। (সিরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩, ৫৬)

বেশির ভাগ সিরাত রচয়িতার অভিমত অনুযায়ী, এই ঘটনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের ৫০ অথবা ৫৫ দিন আগে ঘটেছিল। সে সময় ছিল মহররম মাস। ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে অথবা মার্চের শুরুতে এই ঘটনা ঘটেছিল।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর শত্রুদের নির্যাতন ও পরিণাম

আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন।
(ছাফফাত ৩৭/৯, ফাতহ ৪৮/২৮)।
তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না’
(সাবা ৩৪/২৮)।

তিনি বলেন, ‘অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক। কেননা তুমি উপদেশদাতা বৈ কিছুই নও। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও’। (গাশিয়া ৮৩/২১-২২)।

আল্লাহ প্রেরিত দ্বীন ‘ইসলাম’কে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। অমানুষিক নির্যাতন ও অকথ্য নিপীড়ন নীরবে সহ্য করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর শত্রুদের নির্যাতন ও এর পরিণতি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হ’ল।-

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্র-মাধুর্য : রাসূলূল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্র ও তাঁর আদর্শ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‘আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত আছে’ (আহযাব ৩৩/২১)। তিনি আরো বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم ‘অবশ্যই তুমি মহত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত’ (কলম ৬৮/৪)। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্র সম্পর্কে ফ্রান্সের প্রফেসর সেডইউ বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন হাস্যমুখ ও মিশুক স্বভাবের। তিনি প্রায়ই নীরব থাকতেন এবং অধিকাংশ সময় আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকতেন। অনর্থক কথা হ’তে তিনি দূরে থাকতেন এবং অশ্লীলতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি ছিলেন সঠিক মত ও উত্তম জ্ঞানের অধিকারী।[1]

অধিকাংশ নবী-রাসূল বিভিন্ন প্রকার মুজিযা লাভ করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্যতম মুজিযা ছিল তাঁর চরিত্র। তিনি মানুষের অন্তরসমূহ পরিবর্তন এবং আত্মাকে পবিত্র করে দিতেন চরিত্রের মাধুর্য দিয়ে। এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) লিখেছেন, ‘কোন ব্যক্তি যখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে এক বার আসত, সে ভীত হয়ে পড়ত। আর যে কেউ তাঁর পাশে এসে বসতো সে মহববতে আকৃষ্ট হয়ে যেত।[2]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপরে কাফেরদের নির্যাতন : রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপরে কাফিরদের নির্যাতন ছিল দু’ধরনের। ১. মানসিক, ২. দৈহিক।

মানসিক নির্যাতন : কাফিররা পরিকল্পিতভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে নানা অপবাদ আরোপ করে মানসিকভাবে তাঁকে কষ্ট দিত। তাদের আরোপিত অপবাদসমূহ যেমন- (১) পাগল (তূর ৫২/২৯), (২) কবি (ছাফফাত ৩৭/৩৫-৩৬), (৩) জাদুকর ও (৪)

মিথ্যাবাদী (ছোয়াদ ৩৮/৪), (৫) পুরাকালের উপাখ্যান বর্ণনাকারী (আনফাল ৮/৩১; ফুরক্বান-২৫/৫), (৬) অন্যের সাহায্যে মিথ্যা রচনাকারী (ফুরক্বান-২৫/৪), (৭) মিথ্যা রটনাকারী (নাহল-১৬/১০১; ফুরক্বান-২৫/৪), (৮) ভবিষ্যদ্বক্তা (তূর ৫২/২৯), (৯) পথভ্রষ্ট (তাত্বফীফ ৮৩/৩২), (১০) বেদ্বীন[3], (১১) পিতৃধর্ম বিনষ্টকারী ও (১২) জামা'আত বিভক্তকারী[4], (১৩) জাদুগ্রস্ত (বনী ইসরাঈল ১৭/৪৭), (১৪) মুযাম্মাম (নিন্দিত)।[5] কুরায়েশরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দিয়ে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) বলত।[6] (১৫) 'রা'ইনা' (বাক্বারা ২/১০৪) প্রভৃতি।

এসব নির্যাতনের পরিণতিতে এরা দুনিয়াতে হেদায়াত বঞ্চিত হয় এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন, انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً 'দেখ, ওরা তোমার জন্য কেমন সব উপমা দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব ওরা পথ পেতে পারে না' (বনু ইসরাঈল ১৭/৪৮)।

দৈহিক নির্যাতন : উপরোক্ত মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি এরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর শারীরিক নির্যাতনও করত। নিম্নে কয়েকজনের নির্যাতন ও তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আবু লাহাব ও তার পরিবার কর্তৃক নির্যাতন এবং পরিণতি

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কম-বেশী সকল কাফির- মুশরিক নেতাদের পক্ষ থেকে নির্যাতিত হয়েছেন। তন্মধ্যে আবু লাহাব অন্যতম। আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আব্দুল ওয্যা। সে ছিল আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। সে লালিমাযুক্ত গৌরবর্ণ ও সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ায় তাকে 'আবু লাহাব' অর্থাৎ 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ওয়ালা' বলা হ'ত। এছাড়া 'আব্দুল ওযযা' নাম কুরআনে থাকাটা তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। বিধায় পবিত্র কুরআনে তার আসল নাম বর্জন করা হয়েছে। তাছাড়া আবু লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আপন চাচা ও ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিল। তার পরেও সে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজসহ নানা রকম নির্যাতন করত।

একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাফা পাহাড়ে আরোহণ করে আহবান জানালেন, হে বনু ফিহর! হে বনু আদী! এভাবে কুরায়েশদের বিভিন্ন গোত্রকে। এতে সকল নেতৃস্থানীয় লোক একত্রিত হ'ল। যে পারেনি সে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল কি ব্যাপার জানার জন্য। কুরায়েশরা এসে হাযির হ'ল, আবু লাহাবও তাদের সাথে ছিল। অতঃপর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমি বলি যে, পাহাড়ের অপর প্রান্তে শত্রুসৈন্য অবস্থান করছে। ওরা যেকোন সময় তোমাদের উপর হামলা করতে প্রস্তুত, তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস করবে? সকলে বলল, হ্যাঁ বিশ্বাস করব। কারণ আপনাকে আমরা কখনও মিথ্যা বলতে শুনিনি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শন করছি। আবু লাহাব বলল, তুমি ধ্বংস হও। একথা বলার জন্য তুমি আমাদেরকে এখানে ডেকেছ? তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব নাযিল করেন। যাতে বলা হয়, 'আবু লাহাবের দু'টি হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও'।[7]

অন্যত্র আছে, ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মারার জন্য আবু লাহাব একটি পাথরও তুলেছিল।[8] তার দুই ছেলে উৎবা ও উতাইবার সাথে নবুওয়াত পূর্বকালে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই মেয়ে রুক্বাইয়া ও উম্মে কুলছূমের বিবাহ হয়। কিন্তু নবী হওয়ার পরে সে তার ছেলেদেরকে তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য করে। পরবর্তীতে এই দুই মেয়ের সাথেই একের পর এক ওছমান (রাঃ)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়।[9]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ (উপনাম ত্বাইয়েব বা তাহের) মারা গেলে আবু লাহাব খুশীতে বাগবাগ হয়ে সবার কাছে গিয়ে বলে, মুহাম্মাদ এখন লেজকাটা নির্বংশ (الأَبتر) হয়ে গেল। যার প্রেক্ষিতে সূরা কাওছার নাযিল হয়।

হজ্জের মৌসুমে আবু লাহাব রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছে লেগে থাকত। যেখানেই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিতেন, সেখানেই সে তাঁকে গালি দিয়ে লোকদেরকে ভাগিয়ে দিত এবং বলত, إِنَّهُ صَابِئٌ كَذَّابٌ فَلاَ تُصَدِّقُوْه 'এ লোকটি বিধর্মী মিথ্যাবাদী তোমরা এর কথা বিশ্বাস করো না'।[10] এমনকি 'যুল মাজায' নামক বাজারে যখন তিনি লোকদের বলছিলেন, তোমরা বল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাহ'লে সফলকাম হবে', তখন পিছন থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে সে পাথর ছুঁড়ে মারে। তাতে রাসূলের পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যায়।[11] এভাবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর সে একের পর এক নির্যাতন অব্যাহত রাখে।

অবশেষে আবূ লাহাবের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াবী গযব নেমে আসে। আবু লাহাবের মৃত্যু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও জঘন্যভাবে হয়। বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে নির্জন জায়গায় ফেলে আসে। সেখানে ধুকে ধুকে তার মৃত্যু হয়। তার লাশটি পর্যন্ত কেউ স্পর্শ করেনি। শেষ পর্যন্ত দেহ পঁচতে শুরু করলে গর্ত খুঁড়ে চাকর দ্বারা পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে হেঁচড়ে সে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হয়।[12]

আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল আবু সুফিয়ানের বোন আরওয়া (أروى) অথবা 'আওরা' (العوراء) ওরফে উম্মে জামীল অর্থাৎ সুন্দরের উৎস। সেও স্বামীর একান্ত সহযোগী ছিল এবং সর্বদা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিরুদ্ধে গীবত-তোহমত ও নিন্দাবাদে মুখর থাকত। চোগলখুরী ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে সংসারে বা সমাজে অশান্তির আগুন ধরিয়ে দেওয়া ব্যক্তিকে আরবদের পরিভাষায় حمالة الحطب বা খড়িবাহক বলা হ'ত। অর্থাৎ ঐ শুষ্ক কাঠ যাতে আগুন লাগালে দ্রুত আগুন বিস্তার করে। আবু লাহাবের স্ত্রী একাজটিই করত আড়ালে থেকে। সেকারণ আল্লাহ তাকেও স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রেরণ করবেন। আবু লাহবের স্ত্রী আরওয়া ওরফে উম্মে জামীল রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। সে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যাতায়াতের পথে বা তাঁর বাড়ীর দরজার সম্মুখে কাঁটা ছড়িয়ে বা পুঁতে রাখত। যাতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পান। এই মহিলা ছিল একজন কবি। সে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গ কবিতা পাঠ করে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলত। সূরা লাহাব নাযিল হ'লে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উক্ত মহিলা হাতে পাথর খন্ড নিয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মারার উদ্দেশ্যে কা'বা চত্বরে গমন করে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে থাকা সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে পায়নি। তাই পাশে দাঁড়ানো আবুবকরের কাছে তার মনের ঝাল মিটিয়ে কুৎসা মূলক কবিতা বলে ফিরে আসে। উক্ত কবিতায় সে 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত) নামকে বিকৃত করে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) বলে। যেমন مُذَمَّمًا عَصَيْنَا- وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا- وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا 'নিন্দিতের আমরা নাফরমানী করি। তার নির্দেশ আমরা অমান্য করি। তার দ্বীনকে আমরা ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করি'।[13] আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? জবাবে তিনি বললেন, না, দেখতে পায়নি। আল্লাহ আমার জন্য তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন।[14]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছালাত আদায় করতেন তখন বকরীর নাড়িভুড়ি এমনভাবে ছুঁড়ে মারত যে, সেসব গিয়ে তাঁর গায়ে পড়ত। আবার কখনও কখনও উনুনের ওপর হাঁড়ি চাপানো হ’লে সে হাঁড়িতে নিক্ষেপ করত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অত্যাচারে ঘরের ভিতরে নিরাপদে ছালাত আদায় করার জন্য একটি জায়গা করে নিয়েছিলেন।[15]

মুররাহ আল-হামদানী বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল প্রতিদিন কাঁটাযুক্ত ঝোপের বোঝা এনে মুসলমানদের চলার পথে ছড়িয়ে দিত। ইবনু যায়েদ ও যাহহাক বলেন, সে রাতের বেলায় একাজ করত। একদিন সে বোঝা বহন করে আনতে অপারগ হয়ে একটা পাথরের উপরে বসে পড়ে। তখন ফেরেশতা তাকে পিছন থেকে টেনে ধরেন এবং হালাক করে দেয়’ (কুরতুবী)।

একদিন আবু লাহাবের পুত্র উতায়বা বিন আবু লাহাব এসে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটবর্তী হয়ে বলল, আমি وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ‘নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বিপথগামীও হয়নি (নাজম ৫৩/১-২) এই আয়াত দু’টিকে অস্বীকার করি বলে একটা হেঁচকা টানে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর গায়ের জামা ছিঁড়ে দিল এবং থুথু নিক্ষেপ করল। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বদ দো‘আ করে বললেন, اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ‘আল্লাহ তুমি এর উপরে তোমার কোন একটি কুকুরকে বিজয়ী করে দাও’। কিছুদিন পরে উতায়বা সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফরে গেলে সেখানে ‘যারক্বা’ (الزرقاء) নামক স্থানে রাত্রি যাপন করে। এমন সময় হঠাৎ একটা বাঘকে সে তাদের চারপাশে ঘুরতে দেখে ভয়ে বলে উঠল, هو والله يأكلنى كما دعا محمد على ‘আল্লাহর কসম! এ আমাকে খেয়ে ফেলবে। এভাবেই তো মুহাম্মাদ আমার বিরুদ্ধে দো‘আ করেছিল’। পরদিন সকালে বাঘ এসে সবার মধ্য থেকে তাকে ধরে নিয়ে ঘাড় মটকে হত্যা করল।[16] এভাবে আবু লাহাব, তার স্ত্রী আরওয়া ওরফে উম্মে জামীল ও তাদের পুত্র উতায়বার নির্যাতনের প্রতিকার মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই কার্যকর হ’ল।

২. আবু জাহল কর্তৃক অত্যাচার ও পরিণতি

ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু ছিল আবু জাহল। তার মূল নাম আমর ইবনে হিশাম। জাহেলী যুগে তার উপাধি ছিল আবুল হাকাম। অর্থাৎ জ্ঞানের পিতা। তার আচরণের কারণে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম রাখেন আবু জাহল অর্থাৎ মূর্খের পিতা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, কুরায়েশ সরদারদের নিকটে একদিন আবু জাহল বলল, মুহাম্মাদ আপনাদের সামনে নিজের চেহারায় ধূলো লাগিয়ে রাখে কি? কুরায়েশদের সরদাররা বলল, হ্যাঁ। আবু জাহল বলল, লাত ও ওয্যার শপথ! আমি যদি তাঁকে এ অবস্থায় দেখি, তবে তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে দেব, তাঁর চেহারা মাটিতে হেঁচড়াব। এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ছালাত আদায় করতে দেখে তাঁর ঘাড় মটকে দেয়ার জন্য সে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু সকলে অবাক হয়ে দেখল যে, আবু জাহল চিৎপটাং হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি করছে এবং চিৎকার করে বলছে বাঁচাও বাঁচাও। তার পরিচিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আবুল হাকাম তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি দেখলাম, আমার ও মুহাম্মাদের মধ্যখানে আগুনের একটি পরিখা। ভয়াবহ সে আগুনের পরিখায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, যদি সে আমার কাছে আসত, তবে ফেরেশতা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিড়ে ফেলত'।[17]

একবার আবু জাহল বলল, হে কুরায়েশ ভাইয়েরা! তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, মুহাম্মাদ আমাদের ধর্মের সমালোচনা ও উপাস্যদের নিন্দা থেকে বিরত হচ্ছে না? আমাদের পিতা ও পিতামহকে সারাক্ষণ গালমন্দ করেই চলেছে। এ কারণে আমি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমি একটি ভারী পাথর নিয়ে বসে থাকব, মুহাম্মাদ যখন সিজদায় যাবে, তখন সে পাথর দিয়ে তাঁর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব। এরপর যে কোন পরিস্থিতির জন্য আমি প্রস্তুত। ইচ্ছে হ'লে তোমরা আমাকে বান্ধবহীন অবস্থায় রাখবে, ইচ্ছে হ'লে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। এরপর আবদে মানাফ আমার সাথে যেরূপ ইচ্ছে ব্যবহার করবে এতে আমার কোন পরোয়া নেই। কুরায়েশরা প্রস্তাব শুনার পর বলল, কোন্ ব্যাপারে আমরা তোমাকে বান্ধবহীন অবস্থায় ফেলে রেখেছি? তোমাকে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তুমি যা করতে চাও করতে পার। সকালে আবু জাহল একটি ভারী পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অপেক্ষায় বসে

থাকল। কুরায়েশরা একে একে সমবেত হয়ে আবু জাহলের তৎপরতা দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথারীতি হাযির হয়ে ছালাত আদায় করতে শুরু করলেন। তিনি যখন সিজদায় গেলেন, তখন আবু জাহল পাথর নিয়ে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু পরক্ষণে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফিরে এলো। তার হাত যেন পাথরের সাথে আটকে রইল। কুরায়েশদের কয়েকজন লোক তার কাছে এসে বলল, আবুল হাকাম! তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি যে কথা রাতে বলেছিলাম, তা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পৌঁছাতেই দেখতে পেলাম, মুহাম্মাদ এবং আমার মাঝখানে একটা উট এসে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর কসম! অত বড় লম্বা ঘাঁড় ও দাঁতবিশিষ্ট উট আমি কখনো দেখিনি। উটটি আমাকে হামলা করতে অগ্রসর হচ্ছিল। এ ব্যাপারে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উটের ছদ্মবেশে ছিলেন জিবরীল (আঃ)। আবু জাহল যদি কাছে আসত, তবে তাকে পাকড়াও করা হ'ত।[18]

আবু জাহল একদিন ছাফা পাহাড়ের কাছাকাছি জায়গায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গালমন্দ করে ও শাসিয়ে দেয়। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব রইলেন, কোন কথা বললেন না। এরপর আবু জাহল নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাথায় এক টুকরো পাথর নিক্ষেপ করল। এতে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত বের হ'ল। এরপর আবু জাহল কা'বার সামনে কুরায়েশদের মজলিসে গিয়ে বসল। আব্দুল্লাহ ইবনে জুদয়ানের একজন দাসী এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। ইতিমধ্যে হামযাহ শিকার করে ফিরছিলেন। সেই দাসী তাকে ঘটনা শুনালেন। হামযাহ ঘটনা শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি ছিলেন কুরায়েশদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যুবক। তিনি দেরী না করে সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আবু জাহলকে যেখানে পাব সেখানেই আঘাত করব। এরপর তিনি সোজা কা'বা ঘরে আবু জাহলের সামনে গিয়ে বললেন, ওরে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু ত্যাগকারী! তুই আমার ভাতিজাকে গালি দিয়েছিস, অথচ আমিও তাঁর প্রচারিত দ্বীনের অনুসারী?[19] এ কথা বলে হাতের ধনুক দিয়ে আবু জাহলের মাথায় এত জোরে আঘাত করলেন যে, মাথায় বড় ধরনের জখম হয়ে গেল। এ ঘটনার সাথে সাথে আবু জাহলের গোত্র বনু মাখযূম এবং হামযাহ (রাঃ)-এর গোত্র বনু হাশেমের লোকেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠলো। আবু জাহল সকলকে এই বলে থামিয়ে দিল যে, আবু আমরকে কিছু বল না, আমি তার ভাতিজাকে আসলেই খুব খারাপ ভাষায় গালি দিয়েছিলাম।[20]

ইয়াসির বনু মাখযূমের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্র মুসলমান হন। ফলে তাঁদের উপরে যে ধরনের অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল, তা অবর্ণনীয়। আবু জাহলের নির্দেশে বনু মাখযূমের এই ক্রীতদাস মুসলিম পরিবারের উপরে নৃশংসতম শাস্তি নেমে আসে। তাদেরকে খোলা ময়দানে নিয়ে উত্তপ্ত বালুকার উপরে ফেলে রেখে নানাভাবে নির্যাতন করা হ’ত। একদিন চলার পথে তাদের এই শাস্তির দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, صبرًا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ‘ধৈর্য ধর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হ’ল জান্নাত’। ইয়াসিরের দুই পায়ে দু’টি রশি বেঁধে দু’দিকে দু’টি উটের পায়ে উক্ত রশির অন্য প্রান্ত বেঁধে দিয়ে উট দু’টিকে দু’দিকে জোরে হাঁকিয়ে নেওয়া হয়। তাতে জোরে হেঁচকা টানে ইয়াসিরের দেহ দ্বিখন্ডিত হয়ে যায় এবং সেখানেই তিনি শাহাদতবরণ করেন।[21]
অতঃপর পাষাণ হৃদয় আবু জাহল নিজ হাতে ইয়াসিরের স্ত্রী সুমাইয়ার গুপ্তাঙ্গে বর্শা বিদ্ধ করে তাকে হত্যা করে। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ। অতঃপর তাদের একমাত্র পুত্র আম্মারের উপরে শুরু হয় অবর্ণনীয় নির্যাতনের পালা। তাকে উত্তপ্ত কংকরময় বালুর উপরে হাত, পা বেঁধে পাথর চাপা দিয়ে ফেলে রেখে নির্যাতন করা হয়। একদিন আম্মারকে পানিতে চুবিয়ে আধামরা অবস্থায় উঠিয়ে বলা হ’ল, তুমি যতক্ষণ মুহাম্মাদকে গালি না দিবে এবং লাত, মানাত ও উযযা দেব-দেবীর প্রশংসা না করবে, ততক্ষণ তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি তাদের কথা মেনে নেন।
পরেই তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে গিয়ে কান্না-জড়িত কণ্ঠে সব ঘটনা খুলে বললেন ও আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়- مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ- ‘ঈমান আনার পরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ এবং কঠিন শাস্তি। কিন্তু যাকে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে (তার জন্য কোন চিন্তা নেই)’ (নাহল ১৬/১০৬)। পরে আবুবকর (রাঃ) আম্মার বিন ইয়াসিরকে তার মনিবের কাছ থেকে খরিদ করে নিয়ে মুক্ত করে দেন। আম্মার ঐ সময় আবুবকর (রাঃ)-এর প্রশংসায় যে কবিতা বলেন, তার শুরু ছিল নিম্নরূপ :
جزى الله خيرا عن بلال وصحبه + عتيقا وأخزى فاكهة وأبا جهل
‘আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দান করুন আবুবকর (রাঃ)-কে বেলাল ও তার সাথীদের পক্ষ হ’তে এবং লাঞ্ছিত করুন আবু ফাকীহাহ ও আবু জাহলকে’।[22]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের বিভিন্নভাবে অত্যাচার করার পরিণাম বদর প্রান্তরে এমন ভয়াবহ হবে আবু জাহল তা ভাবতে পারেনি। দুর্বৃত্ত নেতার চারিদিকে ছিল তীর ও তলোয়ার বাহিনীর পাহারা। মুসলিম মুজাহিদের প্রচন্ড হামলায় সেই পাহারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মুসলমানরা লক্ষ্য করলেন যে, আবু জাহল একটি ঘোড়ার পিঠে আরোহী। তার মৃত্যু তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিনে আমি মুসলমানদের কাতারের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখি আমার ডানে ও বামে দু'জন আনছার কিশোর। তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে আমি চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ একজন চুপিসারে বলল, চাচাজান আবু জাহল কে? আমাকে দেখিয়ে দিন। আমি বললাম, তুমি তার কি করবে? সে বলল, আমি শুনেছি সে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দিয়ে কষ্ট দেয়। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন থাকে ততক্ষণ আমি তার সাথে লড়াই করে যাব। বর্নণাকারী (আব্দুর রহমান বিন আওফ) একথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। অন্য আনছার কিশোরও চুপিসারে একই কথা বলল। কয়েক মহূর্ত পরে আমি আবু জাহলকে লোকদের মাঝে বিচরণ করতে দেখলাম। আমি আনছার কিশোরদ্বয়কে বললাম, ঐ দেখো তোমাদের শিকার। এ কথা শুনামাত্র উভয়ে আবু জাহলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেলল।

এরপর তারা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে উপস্থিত হ'ল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আবু জাহলকে হত্যা করেছ? উভয়ে বলল, আমি হত্যা করেছি। তিনি বললেন, তোমরা কি তলোয়ারের রক্ত মুছে ফেলেছ? তারা বলল, না। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের তলোয়ার দেখে বললেন, তোমরা উভয়েই হত্যা করেছ। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহলের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহকে প্রদান করলেন। তাদের একজনের নাম ছিল মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহ ও অপরজনের নাম মু'আবিবয ইবনে আফরা।[23]

এরপর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চলো আমাকে তার লাশ দেখাও। আমরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আবু জাহলের লাশের নিকটে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, এ হচ্ছে এই উম্মাতের ফেরাঊন।[24]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহল, ওতবা ইবনে রাবী‘আ, শায়বা ইবনে রাবী‘আ, ওয়ালীদ ইবনে ওতবা, উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং উকবা ইবনে আবু মুঈত্বসহ অন্যান্য কাফেরের নাম ধরে ধরে বদদো‘আ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর পাশে ছালাত আদায় করছিলেন। আবু জাহল ও তার সাথীরা অদূরে বসেছিল। কিছুক্ষণ পর তার নির্দেশে ভুঁড়ি এনে সিজদারত রাসূলের দুই কাঁধের মাঝখানে চাপিয়ে দিল, যাতে ঐ বিরাট ভুড়ির চাপে ও দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, আমি সব দেখছিলাম। কিন্তু এই অবস্থায় আমার কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে শত্রুরা দানবীয় উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। এই সময় কিভাবে এই দুঃসংবাদ ফাতেমার কানে পৌঁছল। তিনি দৌঁড়ে এসে ভুঁড়িটি সরিয়ে দিয়ে পিতাকে কষ্টকর অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঁচু করে তিনবার বলেন,

اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ.ِ

‘হে আল্লাহ! তুমি কুরায়েশকে ধরো (তিনবার)! হে আল্লাহ! তুমি আমর ইবনে হিশাম অর্থাৎ আবু জাহলকে ধরো। হে আল্লাহ! তুমি উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী‘আহ, ওয়ালীদ বিন উৎবা, উমাইয়া বিন খালাফ, ওক্বা বিন আবী মু‘ঈত্ব এবং ওমারাহ বিন অলীদকে ধরো’। ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, আমি তাদের (উক্ত ৭ জনের) সবাইকে বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কূয়ায় নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখেছি’।[25]

৩. খালাফের পুত্রদ্বয়ের কটূক্তি ও নিপীড়ন

উমাইয়া ও উবাই ছিল খালাফের পুত্র। তারা নানাভাবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দিত। উমাইয়ার অভ্যাস ছিল যে, যখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখত, তখনই কটূক্তি করত, তাঁকে অভিশাপ দিত। মহান আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ‘দুর্ভোগ প্রত্যক ঐ ব্যক্তির, যে সামনে ও পিছনে লোকের নিন্দা করে’ (হুমাযাহ ১০৪/১)। ইবনে হিশাম বলেন, হুমাযা সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গালাগালি করে এবং পশ্চাতে মানুষের নিন্দা করে এবং কষ্ট দেয়।[26]

উমাইয়া ইবনে খালাফের ক্রীতদাস ছিলেন বেলাল (রাঃ)। ইসলাম গ্রহণের পর উমাইয়া বেলালের গলায় দড়ি বেঁধে মক্কার উচ্ছৃঙ্খল বালকদের হাতে তুলে দিত। বালকেরা তাঁকে মক্কার বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেত। এরকম করার ফলে তাঁর গলায় দড়ির দাগ পড়ে যেত। উমাইয়া নিজে তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করত। এরপর উত্তপ্ত বালুর উপর জোর করে শুইয়ে রাখত। এ সময়ে তাঁকে অনাহারে রাখা হ’ত। এমনকি কখনো কখনো তাঁকে দুপুরের তীব্র রোদে মরু বালুকার উপর শুইয়ে বুকের উপর ভারী পাথর চাঁপা দিয়ে রাখত।[27]

একবার সা'দ ইবনে মু‘আয (রাঃ) মক্কায় উমাইয়া ইবনে খালাফকে বলেছিলেন, হে উমাইয়া! আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, মুসলমানরা তোমাকে হত্যা করবে। একথা শুনে উমাইয়া ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। এ ভয় তার সব সময় ছিল। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কখনও মক্কার বাইরে যাবে না। আবু জাহলের পীড়াপীড়িতে উমাইয়া বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সবচেয়ে দ্রুতগামী উট ক্রয় করে। যাতে করে বিপদের সময় খুব দ্রুত পালিয়ে আসতে পারে। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় তার স্ত্রী তাকে বলছিল, আবু ছাফয়ান! আপনার ইয়াছরেবী ভাই যে কথা বলেছিলেন, আপনি কি সে কথা ভুলে গেছেন? সে বলল, না ভুলিনি, আমি তো ওদের সাথে কিছুদূর যাব।[28]

মক্কায় জাহেলী যুগ থেকেই আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ও উমাইয়া ইবনে খালাফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। বদর যুদ্ধের দিনে উমাইয়া তার সন্তান আলীর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া কয়েকটি বর্ম নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে উমাইয়া

বলল, আমি কি তোমার প্রয়োজনে লাগতে পারি? তোমার বর্মগুলোর চেয়ে আমরা উত্তম। আজকের মত দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি। তোমাদের কি দুধের প্রয়োজন নেই?[29] এ কথা শুনে আব্দুর রহমান বর্মগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং উমাইয়া ও তার পুত্রকে বন্দী করে সামনের দিকে অগ্রসর হ'লেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বলেন, আমি তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় বেলাল (রাঃ) উমাইয়াকে দেখে ফেললেন। তিনি তাকে দেখে বললেন, ওহে কাফেরদের সরদার উমাইয়া ইবনে খালফ! হয় আমি বেঁচে থাকব নতুবা তুমি বেঁচে থাকবে। এরপর উচ্চৈঃস্বরে বললেন, ওহে আনছাররা! এই দেখো কাফের

কাফেরদের সরদার উমাইয়া ইবনে খালফ, এবার হয় আমি থাকব নতুবা সে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, ততক্ষণে লোকেরা আমাদেরকে ঘিরে ফেললেন। আমি তাদের রক্ষা করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু একজন ছাহাবী তলোয়ার তুলে উমাইয়ার পুত্র আলীর পায়ে আঘাত করলেন। সাথে সাথে সে ঢলে পড়ল। এদিকে উমাইয়া এমন জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলে যে, আমি এত বিকট শব্দ কখনও শুনিনি। আমি বললাম, পালাও পালাও। কিন্তু আজতো পালানোর পথ নেই। আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোমার কোন উপকারে আসতে পারব না। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, উত্তেজিত ছাহাবাগণ উমাইয়া ও তার পুত্র আলীকে ঘিরে ফেলে আঘাতে আঘাতে হত্যা করে ফেলল।[30]

উবাই ইবনে খালাফ উমাইয়ার ভাই। উকবা ইবনে আবু মুঈত্বের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। উকবা উবাইয়ের কথা মত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে থুথু নিক্ষেপ করেছিল। উবাই বিন খালাফ নিজে একবার মরা-পচা হাড্ডি চূর্ণ করে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গিয়ে তাঁর মুখের দিকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। যাতে তাঁর মুখ ভর্তি হয়ে যায় এবং দুর্গন্ধে বমি হবার উপক্রম হয়।[31] সে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত এবং হত্যার হুমকিও দিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকাকালে দেখা হ'লে সে গর্বভরে বলত, 'হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে 'আওদ' নামের একটি ঘোড়া রয়েছে; ওকে আমি প্রতিদিন তিন ছা' (সাড়ে সাত কিলোগ্রাম) খাবার খাওয়াচ্ছি। সেই ঘোড়ার পিঠে বসে একদিন আপনাকে হত্যা করব। জবাবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, উল্টাও হ'তে পারে। ইনশাআল্লাহ আমিই তোমাকে হত্যা করব।[32]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহোদের যুদ্ধে ময়দানে পৌঁছার পর উবাই ইবনে খালাফ একথা বলে সামনে অগ্রসর হ'ল যে, মুহাম্মাদ কোথায়? হয়ত আমি থাকব নতুবা তিনি থাকবেন। ছাহাবীগণ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব? নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওকে আসতে দাও। এই দুর্বৃত্ত কাছে এলে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারেছ ইবনে সাম্মার (রাঃ) নিকট থেকে ছোট একটি বর্শা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। এটা ছিল ঠিক তেমনি, যেমন গায়ে মাছি বসলে উট একটুখানি ঝাঁকুনি দেয়, এতে মাছি উড়ে যায়। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর উবাইয়ের মুখোমুখি হ'লেন, ইবনে খালাফের শিরস্ত্রাণ ও বর্মের মাঝামাঝি একটুখানি জায়গা (গলার কাছে) খালি ছিল। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই স্থান লক্ষ্য করে হাতের বর্শা নিক্ষেপ করলেন।

এতে উবাই ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিল এবং তার মিত্রদের কাছে ফিরে গেল। তার গলার কাছে সামান্য কেটে গিয়েছিল বটে, কিন্তু রক্ত বের হয়নি। আঘাতও তেমন ছিল না। তবুও সে চিৎকার করে বলতে লাগল, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ আমাকে হত্যা করেছেন। লোকেরা তাকে বলল, কি বাজে বকছ? তোমার আঘাত তো তেমন গুরুতর নয়। গলায় সামান্য আঁচড় লাগার মত দেখা যাচ্ছে। উবাই বলল, তিনি মক্কায় আমাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে হত্যা করব। কাজেই আল্লাহর শপথ! আমার প্রাণ চলে যাবে।[33]

সে গাভীর মত চিৎকার করে বলত, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি যে যন্ত্রণা অনুভব করছি, সেই কষ্ট-যন্ত্রণা যদি যিল-মাযাযের অধিবাসীরা অনুভব করত, তাহ'লে তারা সবাই মারা যেত।[34] অন্যত্র আছে, সে বারবার বলছিল, মুহাম্মাদ মক্কায় বলছিলেন, আমিই তোমাকে হত্যা করব। তিনি যদি আমাকে থুথুও নিক্ষেপ করতেন, তবুও আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত।[35]

অবশেষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু উবাই ইবনে খালাফ মক্কায় ফেরার পথে সারিফ নামক স্থানে মারা যায়।

উপসংহার

পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে নববী যুগে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই আল্লাহ তায়ালার সাথে নাফরমানি করা অবাধ্যরা যুগে যুগে ধ্বংস হবে। নববী যুগে কাফেররা নত হয়েছিল নবীজী ও সাহাবায়ে কেরামদের হাতে। ইতিহাসের পাতায় আজও দাপিয়ে বেড়ায় সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি রহ এর হাতে ক্রুসেডারদের পরাজয়। ফিলিস্তিনে মুসলমানদের জয়।

ফাতিহ সুলতান মুহাম্মদ এর হাতে কন্সটান্টিনোপাল এর পতন, মুসমানদের রোম জয়। তেমনি অত্যাচারী রাজা দাহিরের হাত থেকে ভারতবর্ষ ছিনিয়ে নেয়া ১৭ বছরের সাহসী যুবক মুহাম্মদ বিন কাসিম।

যুগে যুগে রব্বুল আলামীনের দয়ায়, ঈমানদানরা আল্লাহর অবাধ্যদের শায়েস্তা করেছেন।

আল্লাহ তায়ালার দেওয়া বিধান অনুযায়ী আমরা অনেক মুসলিম বান্দা তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করি না। আল্লাহর পথ অনুসরণ না করা বান্দা তার ক্রোধের পাত্র হয়ে জাহান্নামী হবে।

কুরআনুল করিমে এ বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্টোভাবে বর্ণিত হয়েছে- যে ব্যক্তি আল্লাহর দেখানো পথ অনুসরণ করেন, সে কি আল্লাহর আক্রোশে পতিত লোকের ন্যায় হতে পারে? তার নিবাস হলো একমাত্র জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট! (সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৬২-১৬৩)

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত, আর যিনি খেয়ানতকারী তাদের দুইজনের অবস্থান কখনোই সমান হতে পারেন না। এই দুই প্রকৃতির বান্দা আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে হবে ভিন্ন।

যেসব ব্যক্তিবর্গ সত্যের পথে চলে আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন অতিবাহিত করেন তারা হবেন পরম সুখময় জীবনের অধিকারী অর্থাৎ জান্নাতবাসী। আর যেসব ব্যক্তি আল্লাহর পথ অনুসরণে অস্বীকার ও অনীহা দেখায় তাদের একমাত্র শাস্তি হলো জাহান্নাম যা কিনা অতীব কষ্টের জায়গা অর্থাৎ জাহান্নামবাসী।

মহান রব্বুল আলামিন আমাদের সকলের কার্যকলাপসমূহ অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে তার যথার্থ বিচার করেন। দুনিয়ার কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নয়।
মহান আল্লাহ বিশ্বের সকল মুসলিম বান্দাদের তাঁর দেখানো পথ অনুসরণের আমল করার এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন।

আল্লহুম্মা আমীন।

তথ্যসূত্র:

1]. কাযী সুলাইমান মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল আলামীন, অনুবাদ: ড. মু. মুজীবুর রহমান (রাজশাহী : মুহাম্মদী প্রকাশনী সংস্থা, ১৯৯৭), ১/২২৫ পৃঃ।

[2]. রহমাতুল্লিল আলামীন ১/২২৬ পৃঃ।

[3]. আর-রাহীকুল মাখতূম, ১৭তম সংস্করণ ২০০৫ইং, পৃঃ ৮৬।

[4]. ঐ, পৃঃ ৯৫।

[5]. ঐ, পৃঃ ৮৭।

[6]. বুখারী, মিশকাত হা/৫৭৭৮।

[7]. বুখারী হা/৪৭৭০, ৪৮০১; মুসলিম হা/২০৮।

[8]. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, ভাষান্তর: খাদিজা আখতার রেযায়ী (ঢাকা : আল-কোরআন একাডেমী লন্ডন, ১৯৯০), ১১০ পৃঃ।

[9]. সায়্যিদ কুতুব, তাফসীর ফী যিলাযিল কুর‘আন, (মিশর: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী), ৩/২৮২পৃঃ।

[10]. আহমাদ হা/১৬০৬৬, ১৬০৬৯, সনদ হাসান; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫৯, সনদ ছহীহ।

[11]. ছহীহ ইবনু হিববান, হাকেম ২/৬১১; দারাকুৎনী হা/২৯৫৭, সনদ হাসান; তফসীরে কুরতুবী।

[12]. আর-রাহীকুল মাখতূম, ২৫২-২৫৩ পৃঃ।

[13]. বুখারী, মিশকাত হা/৫৭৭৮।

[14]. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৩৫-৩৩৬।

[15]. ইবনে হিশাম ১/৪১৬ পৃঃ।

[16]. শায়খ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ, মুখতাছার সীরাতে রাসূল, ১/১৩৫ পৃঃ।

[17]. মুসলিম হা/২৭৯৭; মিশকাত হা/৫৮৫৬।

[18]. ইবনে হিশাম ১/২৯৮-২৯৯ পৃঃ।

[19]. নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের শেষ দিকে যিলহজ্জ মাসে হামযাহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

[20]. রহমাতুল্লিল আলামীন ১/৫৩ পৃঃ; ইবনে হিশাম ১/২৯১-২৯২ পৃঃ।

[21]. ইবনে হিশাম ১/৩২০ পৃঃ।

[22]. সুবুলুল হুদা, ২/৩৬২; সীরাতে ইবনে ইসহাক ১/১৯১।

[23]. মুসলিম হা/১৭৫২; মিশকাত হা/৪০২৮।

[24]. আর-রাহীকুল মাখতূম ২৪৭ পৃঃ।

[25]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪৭; 'রাসূলের আবির্ভাব ও অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ।

[26]. ইবনে হিশাম ১/৩৫৬-৩৫৭ পৃঃ।

[27]. রহমাতুল্লিল আলামীন ১/৪৫ পৃঃ।

[28]. বুখারী ২/৫৬৩, আর-রাহীকুল মাখতূম ১৪৮ পৃঃ।

[29]. যে ব্যক্তি আমাকে বন্দী করবে মুক্তিপণ হিসাবে আমি তাকে অনেক দুধেল উটনী দেব।

[30]. আর-রাহীকুল মাখতূম, ২৪৯ পৃঃ।

[31]. ইবনে হিশাম, ১/৩৬১-৩৬২ পৃঃ।

[32]. আর-রাহীকুল মাখতূম, ৪৮ নং টিকা, ৩০৪ পৃঃ।

[33]. যাদুল মা'আদ, ২/০৭ পৃঃ।

[34]. মুখতাছার সীরাতুর রাসূল, ২৫০ পৃঃ।

[35]. আর-রাহীকুল মাখতূম, ১৪৭ পৃঃ।

[36]. ইবনে হিশাম, ২/৮৪ পৃঃ।